আশ্বিন ১২৮৪ - ভাদ্র ১২৮৫

র বী ন্দ্র না থ ঠা কু র

করুণা

ভূমিকা

গ্রামের মধ্যে অনূপকুমারের ন্যায় ধনবান আর কেহই ছিল না। অতিথিশালানির্মাণ, দেবালয়প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতি নানা সৎকর্মে তিনি ধনব্যয় করিতেন। তাঁহার সিন্ধুক-পূর্ণ টাকা ছিল, দেশবিখ্যাত যশ ছিল ও রূপবতী কন্যা ছিল। সমস্ত যৌবনকাল ধন উপার্জন করিয়া অনূপ বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখন কেবল তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল যে, কন্যার বিবাহ দিবেন কোথায়। সৎপাত্র পান নাই ও বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র আশ্রয়স্থল কন্যাকে পরগৃহে পাঠাইতে ইচ্ছা নাই-- তজ্জন্যও আজ কাল করিয়া আর তাঁহার দুহিতার বিবাহ হইতেছে না।

সঙ্গিনী-অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার স্বপ্নে সে সমস্ত দিন-রাত্রি এমন সুখে কাটাইয়া দিত যে, মুহূর্তমাত্রও তাহাকে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। তাহার একটি পাখি ছিল, সেই পাখিটি হাতে করিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর পাড়ে কল্পনার রাজ্য নির্মাণ করিত। কাঠবিড়ালির পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া, জলে ফুল ভাসাইয়া, মাটির শিব গড়িয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইয়া দিত। এক-একটি গাছকে আপনার সঙ্গিনী ভগ্নী কন্যা বা পুত্র কল্পনা করিয়া তাহাদের সত্য-সত্যই সেইরূপ যত্ন করিত, তাহাদিগকে খাবার আনিয়া দিত, মালা পরাইয়া দিত, নানাপ্রকার আদর করিত এবং তাদের পাতা শুকাইলে, ফুল ঝরিয়া পড়িলে, অতিশয় ব্যথিত হইত। সন্ধ্যাবেলা পিতার নিকট যা-কিছু গল্প শুনিত, বাগানে পাখিটিকে তাহাই শুনানো হইত। এইরূপে করুণা তাহার জীবনের প্রত্যুষকাল অতিশয় সুখে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পিতা ও প্রতিবাসীরা মনে করিতেন যে, চিরকালই বুঝি ইহার এইরূপে কাটিয়া যাইবে।

কিছু দিন পরে করুণার একটি সঙ্গী মিলিল। অনূপের অনুগত কোনো একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মরিবার সময় তাঁহার অনাথ পুত্র নরেন্দ্রকে অনুপকুমারের হস্তে সঁপিয়া যান। নরেন্দ্র অনূপের বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত, পুত্রহীন অনুপ নরেন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। নরেন্দ্রের মুখশ্রী বড়ো প্রীতিজনক ছিল না কিন্তু সে কাহারও সহিত মিশিত না, খেলিত না ও কথা কহিত না বলিয়া, ভালোমানুষ বলিয়া তাহার বড়োই সুখ্যাতি হইয়াছিল। পল্লীময় রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, নরেন্দ্রের মতো শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালক আর নাই এবং পাড়ায় এমন বৃদ্ধ ছিল না যে তাহার বাড়ির ছেলেদের প্রত্যেক কাজেই নরেন্দ্রের উদাহরণ উত্থাপন না করিত।

কিন্তু আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে, 'নরেন্দ্র, তুমি বড়ো ভালো ছেলে নও।' কে জানে নরেন্দ্রের মুখশ্রী আমার কোনোমতে ভালো লাগিত না। আসল কথা এই, অমন বাল্যবৃদ্ধ গম্ভীর সুবোধ শান্ত বালক আমার ভালো লাগে না।

অনুপকুমারের স্থাপিত পাঠশালায় রঘুনাথ সার্বভৌম নামে এক গুরুমহাশয় ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে অপরিমিত ভালোবাসিতেন, নরেন্দ্রকে প্রায় আপনার বাড়িতে লইয়া যাইতেন এবং অনুপের নিকট তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

এই নরেন্দ্রই করুণার সঙ্গী। করুণা নরেন্দ্রের সহিত সেই পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়া কাদার ঘর নির্মাণ করিত, ফুলের মালা গাঁথিত এবং পিতার কাছে যে-সকল গল্প শুনিয়াছিল তাহাই নরেন্দ্রকে শুনাইত, কাল্পনিক বালিকার যত কল্পনা সব নরেন্দ্রের উপর ন্যস্ত হইল। করুণা নরেন্দ্রকে এত ভালোবাসিত যে কিছুক্ষণ তাহাকে না দেখিতে পাইলে ভালো থাকিত না, নরেন্দ্র পাঠশালে গেলে সে সেই পাখিটি হাতে করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিত, দূর হইতে নরেন্দ্রকে দেখিলে তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া

সেই পুষ্করিণীর পাড়ে সেই নারিকেল গাছের তলায় আসিত, ও তাহার কল্পনারচিত কত কী অদ্ভুত কথা শুনাইত।

নরেন্দ্র ক্রমে কিছু বড়ো হইলে কলিকাতায় ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। কলিকাতার বাতাস লাগিয়া পল্লীগ্রামের বালকের কতকগুলি উৎকট রোগ জন্মিল। শুনিয়াছি স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার ব্যয় যাহাকিছু পাইত তাহাতে নরেন্দ্রের তামাকের খরচটা বেশ চলিত। প্রতি শনিবারে দেশে যাইবার নিয়ম আছে। কিন্তু নরেন্দ্র তাহার সঙ্গীদের মুখে শুনিল যে, শনিবারে যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়া হয় তবে গলায় দড়ি দিয়া মরাটাই বা কী মন্দ ! বালক বাটীতে গিয়া অনূপকে বুঝাইয়া দিল যে, সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন বাড়িতে থাকিলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অনূপ নরেন্দ্রের বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ দেখিয়া মনে-মনে ঠিক দিয়া রাখিলেন যে, বড়ো হইলে সে ডিপুটি মাজিস্টর হইবে। তখন দুই-এক মাস অন্তর নরেন্দ্র বাড়িতে আসিত। কিন্তু এ আর সে নরেন্দ্র নহে। পানের পিকে ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া, দুই পার্শ্বের দুই সঙ্গীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কন্স্টেবল্দের ভীতিজনক যে নরেন্দ্র প্রদোষে কলিকাতার গলিতে গলিতে মারামারি খুঁজিয়া বেড়াইত, গাড়িতে ভদ্রলোক দেখিলে কদলীর অনুকরণে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিত, নিরীহ পান্থ বেচারিদিগের দেহে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নির্দোষীর মতো আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিত, এ সে নরেন্দ্র নহে-- অতি নিরীহ, আসিয়াই অনুপকে ঢীপ্ করিয়া প্রণাম করে। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে মৃদুস্বরে, নতমুখে, অতি দীনভাবে উত্তর দেয় এবং যে পথে অনুপ সর্বদা যাতায়াত করেন সেইখানে একটি ওয়েব্স্টার ডিক্সনারী বা তৎসদৃশ অন্য কোনো দীর্ঘকায় পুস্তক খুলিয়া বসিয়া থাকে।

নরেন্দ্র বহুদিনের পর বাড়ি আসিলে করুণা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। নরেন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া কত কী গল্প শুনাইত। বালিকা গল্প শুনাইতে যত উৎসুক, শুনিতে তত নহে। কাহারো কাছে কোনো নূতন কথা শুনিলেই যতক্ষণ না নরেন্দ্রকে শুনাইতে পাইত, ততক্ষণ উহা তাহার নিকট বোঝা-স্বরূপ হইয়া থাকিত। কিন্তু করুণার এইরূপ ছেলেমানুষিতে নরেন্দ্রের বড়োই হাসি পাইত, কখনো কখনো সে বিরক্ত হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিত। নরেন্দ্র সঙ্গীদের নিকটে করুণার কথাপ্রসঙ্গে নানাবিধ উপহাস করিত।

নরেন্দ্র বাড়ি আসিলে পণ্ডিতমহাশয় সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এমন-কি, সেদিন সন্ধ্যার সময়েও গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বাঁশঝাড়ময় পল্লীপথ দিয়া রাম-নাম জপিতে জপিতে নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, নরেন্দ্রকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া নানাবিধ কুশলসংবাদ লইতেন। এই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া দুই-একজন সঙ্গী নরেন্দ্রকে তাঁহার টিকি কাটিতে পরামর্শ দিয়াছিল, এ বিষয় লইয়া গম্ভীর ভাবে অনেক পরামর্শ ও অনেক ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, কিন্তু দেশে নরেন্দ্রের তেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল না বলিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের টিকিটি নির্বিঘ্নে ছিল।

এই রূপে দেশে আদর ও বিদেশে আমোদ পাইয়া নরেন্দ্র বাড়িতে লাগিল। নরেন্দ্রের বাল্যকাল অতীত হইল।

অনুপ এখন অতিশয় বৃদ্ধ, চক্ষে দেখিতে পান না, শয্যা হইতে উঠিতে পারেন না, এক মুহূর্তও করুণাকে কাছ-ছাড়া করিতেন না। অনূপের জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে ; তিনি নরেন্দ্রকে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছেন, অন্তিম কালে নরেন্দ্র ও পণ্ডিতমহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহাদের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

অনুপের মৃত্যুর পর সার্বভৌমমহাশয় নিজে পৌরোহিত্য করিয়া নরেন্দ্রের সহিত করুণার বিবাহ দিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে। নরেন্দ্র যে কিরূপ লোক তাহা এত দিনে পাড়ার লোকেরা টের পাইল, আর হতভাগিনী করুণাকে যে কষ্ট পাইতে হইবে তাহা এত দিনে তাহারা বুঝিতে পারিল। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় দুয়ের কোনোটাই বুঝিলেন না।

করুণা আজকাল কিছু মনের কষ্টে আছে। মনের উল্লাসে বিজন কাননে সে খেলা করিবে, বক্ষে করিয়া লইয়া পাখির সঙ্গে কত কী কথা কহিবে, কোলের উপর রাশি রাশি ফুল রাখিয়া পাদুটি ছড়াইয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাইতে গাইতে মালা গাঁথিবে, যাহাকে ভালোবাসে তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অস্ফুট আহ্লাদে বিহ্বল ও অস্ফুট ভাবে ভোর হইয়া যাইবে--সেই বালিকা বড়ো কষ্ট পাইয়াছে। তাহার মনের মতো কিছুই হয় না। অভাগিনী যে নরেন্দ্রকে এত ভালোবাসে--যাহাকে দেখিলে খেলা ভুলিয়া যায়, মালা ফেলিয়া দেয়, পাখি রাখিয়া দিয়া ছুটিয়া আসে, সে কেন করুণাকে দেখিলে যেন বিরক্ত হয়। করুণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কী বলিতে আসে, সে কেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে। করুণা তাহাকে কাছে বসিতে কত মিনতি করে, সে কেন কোনো ছল করিয়া চলিয়া যায়। নরেন্দ্র তাহার সহিত এমন নির্জীবভাবে এমন নীরসভাবে কথাবার্তা কয়, সকল কথায় এমন বিরক্তভাবে উত্তর দেয়, সকল কাজে এমন প্রভুভাবে আদেশ করে যে, বালিকার খেলা ঘুরিয়া যায় ও মালা গাঁথা সাঙ্গ হয় বুঝি--বালিকার আর বুঝি পাখির সহিত গান গাওয়া হইয়া উঠে না।

মূল কথাটা এই, নরেন্দ্র ও করুণায় কখনোই বনিতে পারে না। দুইজনে দুই বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত। নরেন্দ্র করুণার সেই ভালোবাসার কত কী অসংলগ্ন কথার মধ্যে কিছুই মিষ্টতা পাইত না, তাহার সেই প্রেমে-মাখানো অতৃপ্ত স্থির দৃষ্টি-মধ্যে ঢলঢল লাবণ্য দেখিতে পাইত না, তাহার সেই উচ্ছ্বসিত নির্ঝরিণীর ন্যায় অধীর সৌন্দর্যের মিষ্টতা নরেন্দ্র কিছুই বুঝিত না। কিন্তু সরলা করুণা, সে অত কী বুঝিবে ! সে ছেলেবেলা হইতেই নরেন্দ্রের গুণ ছাড়া দোষের কথা কিছুই শুনে নাই। কিন্তু করুণার একি দায় হইল। তাহার কেমন কিছুতেই আশ মিটে না, সে আশ মিটাইয়া নরেন্দ্রকে দেখিতে পায় না, সে আশ মিটাইয়া মনের সকল কথা নরেন্দ্রকে বলিতে পারে না--সে সকল কথাই বলে অথচ মনে করে যেন কোনো কথাই বলা হইল না।

একদিন নরেন্দ্রকে বেশ পরিবর্তন করিতে দেখিয়া করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "কলিকাতায়।"

করুণা। কলিকাতায় কেন যাইবে।

নরেন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কাজ না থাকিলে কখনো যাইতাম না।" একটা বিড়ালশাবক ছুটিয়া গেল। করুণা তাহাকে ধরিতে গেল, অনেক ক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া ধরিতে পারিল না। অবশেষে ঘরে ছুটিয়া আসিয়া নরেন্দ্রের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, "আজ যদি তোমাকে কলিকাতায় যাইতে না দিই ?

নরেন্দ্র কাঁধ হইতে হাত ফেলিয়া দিয়া কহিল, "সরো, দেখো দেখি, আর একটু হলেই ডিক্যান্টার্‌টি ভাঙিয়া ফেলিতে আর কি।"

করুণা। দেখো, তুমি কলিকাতায় যাইয়ো না। পণ্ডিতমহাশয় তোমাকে যাইতে দিতে নিষেধ করেন।

নরেন্দ্র কিছুই উত্তর না দিয়া শিস্ দিতে দিতে চুল আঁচড়াইতে লাগিলেন। করুণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ও এক শিশি এসেন্স্ আনিয়া নরেন্দ্রের চাদরে খানিকটা ঢালিয়া দিল।

নরেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। করুণা দুই একবার বারণ করিল, কিছু হাঁ হুঁ না দিয়া লক্ষ্মৌ ঠুংরি গাইতে গাইতে নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ নরেন্দ্রকে দেখা যায় করুণা চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর সে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত হইতেই চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া পাখিটি হাতে করিয়া লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে মালা গাঁথিতে বসিল।

বালিকা স্বভাবতঃ এমন প্রফুল্লহৃদয় যে, বিষাদ অধিক ক্ষণ তাহার মনে তিষ্ঠিতে পারে না। হাসির লাবণ্যে তাহার বিশাল নেত্র দুটি এমন মগ্ন যে রোদনের সময়ও অশ্রুর রেখা ভেদ করিয়া হাসির কিরণ জ্বলিতে থাকে। যাহা হউক, করুণার চপল ব্যবহারে পাড়ার মেয়েমহলে বেহায়া বলিয়া তাহার বড়োই

অখ্যাতি জন্মিয়াছিল--'বুড়াধাড়ি মেয়ে'র অতটা বাড়াবাড়ি তাহাদের ভালো লাগিত না। এ-সকল নিন্দার কথা করুণা বাড়ির পুরাতন দাসী ভবির কাছে সব শুনিতে পাইত। কিন্তু তাহাতে তাহার আইল গেল কী ? সে তেমনি ছুটাছুটি করিত, সে ভবির গলা ধরিয়া তেমনি করিয়াই হাসিত, সে পাখির কাছে মুখ নাড়িয়া তেমনি করিয়াই গল্প করিত। কিন্তু এই প্রফুল্ল হৃদয় একবার যদি বিষাদের আঘাতে ভাঙিয়া যায়, এই হাস্যময় অজ্ঞান শিশুর মতো চিন্তাশূন্য সরল মুখশ্রী একবার যদি দুঃখের অন্ধকারে মলিন হইয়া যায়, তবে বোধ হয় বালিকা আহত লতাটির ন্যায় জন্মের মতো ম্রিয়মাণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, বর্ষার সলিলসেকে--বসন্তের বায়ুবীজনে আর বোধহয় সে মাথা তুলিতে পারে না।

নরেন্দ্র অনুপের যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহাতে পল্লিগ্রামে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। অনুপের জীবদ্দশায় খেতেন ধান, পুকুরের মাছ ও বাগানের শাক-সব্জি ফলমূলে দৈনিক আহারব্যয় যৎসামান্য ছিল। ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইত, নিয়মিত পূজা-অর্চনা দানধ্যান ও আতিথ্যের ব্যয় ভিন্ন আর কোনো ব্যয়ই ছিল না। অনূপের মৃত্যুর পর অতিথিশালাটি বাবুর্চিখানা হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণগুলার জ্বালায় গোটা চারেক দরোয়ান রাখিতে হইল, তাহারা প্রত্যেক ভট্টাচার্যকে রীতিমত অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিত এবং প্রত্যেক ভট্টাচার্য বিধিমতে নরেন্দ্রকে উচ্ছিন্ন যাইবার ব্যবস্থা করিয়া যাইত। নরেন্দ্র গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি ডিস্‌পেন্‌সরি স্থাপন করিলেন। শুনিয়াছি নহিলে সেখানে ব্রাণ্ডি কিনিবার অন্য কোনো সুবিদা ছিল না। গবর্নমেন্টের সস্তা দোকান হইতে রায়বাহাদুরের খেলানা কিনিবার জন্য ঘোড়দৌড়ের চাঁদা-পুস্তকে হাজার টাকা সই করিয়াছিলেন এবং এমন আরো অনেক সৎকার্য করিয়াছিলেন যাহা লইয়া অমৃতবাজারের একজন পত্রপেরক ভারি ধূমধাম করিয়া এক পত্র লেখে। তাহার প্রতিবাদ ও তাহার পুনঃপ্রতিবাদের সময় অমূলক অপবাদ দেওয়া যে ভদ্রলোকের অকর্তব্য ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়।

নরেন্দ্রকে পল্লীর লোকেরা জাতিচ্যুত করিল, কিন্তু নরেন্দ্র সে দিকে কটাক্ষপাতও করিলেন না। নরেন্দ্রের একজন সমাজসংস্কারক বন্ধু তাঁহার 'মরাল করেজ' লইয়া সভায় তুমুল আন্দোলন করিলেন। নরেন্দ্র বাগবাজারে এক বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন ও কাশীপুরে এক বাগান ক্রয় করিয়াছেন। একদিন বাগবাজারের বাড়িতে সকালে বসিয়া নরেন্দ্র চা খাইতেছেন--নরেন্দ্রের সকাল ও আমাদের সকালে অনেক তফাত, সেদিন শনিবারে কুঠি যাইবার সময় দেখিয়া আসিলাম, নরেন্দ্রের নাক ডাকিতেছে। দুইটার সময় ফিরিয়া আসিবার কালে দেখি চোখ রগড়াইতেছেন, তখনও আন্তরিক ইচ্ছা আর-এক ঘুম দেন। যাহাই হউক নরেন্দ্র চা খাইতেছেন এমন সময়ে সমাজসংস্কারক গদাধরবাবু, কবিতাকুসুমমঞ্জরীপ্রণেতা কবিবর স্বরূপচন্দ্রবাবু, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম অভ্যর্থনা সমাপ্ত হইলে সকলে চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন।

নানাবিধ কথোপকথনের পর গদাধরবাবু কহিলেন, "দেখুন মশায়, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের দশা বড়ো শোচনীয়।"

এই সময়ে নরেন্দ্র শোচনীয় শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বরূপচন্দ্রবাবু কহিলেন-- 'ধনসরযক্ষতথরন' । নরেন্দ্রের পক্ষে উভয় কথাই সমান ছিল, কিন্তু নরেন্দ্র এই প্রতিশব্দটি শুনিয়া শোচনীয় শব্দের অর্থটা যেন জল বুঝিয়া গেলেন। গদাধরবাবু কহিলেন, "এখন আমাদিগের উচিত তাহাদের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিয়া দেওয়া।"

অমনি নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "কিন্তু এটা কতদূর হতে পারে তাই দেখা যাক। তেমন সুবিধা পাইলে অন্তঃপুরের প্রাচীর অনেক সময় ভাঙিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু পুলিসের লোকেরা তাহাতে বড়োই আপত্তি করিবে। ভাঙিয়া ফেলা দূরে থাক, একবার আমি অন্তঃপুরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে গিয়াছিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট তাতে আমার উপর বড়ো সন্তুষ্ট হয় নাই।"

অনেক তর্কের পর গদাধর ও স্বরূপে মিলিয়া নরেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল যে, সত্যসত্যই অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইতেছে না--তাহার তাৎপর্য এই যে, স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুর হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া।

গদাধরবাবু কহিলেন, "কত বিধবা একাদশীর যন্ত্রণায় রোদন করিতেছে, কত কুলীনপত্নী স্বামী জীবিত-সত্ত্বেও বৈধব্যজ্বালা সহ্য করিতেছে।"

স্বরূপবাবু কহিলেন, "এ বিষয়ে আমার অনেক কবিতা আছে, কাগজওয়ালারা তার বড়ো ভালো সমালোচনা করেছে। দেখো নরেন্দ্রবাবু, শরৎকালের জ্যোৎস্নারাত্রে কখনো ছাতে শুয়েছ ? চাঁদ যখন ঢলঢল হাসি ঢালতে ঢালতে আকাশে ভেসে যায় তখন তাকে দেখেছ ? আবার সেই হাস্যময় চাঁদকে যখন ঘোর অন্ধকারে মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট উপস্থিত হয়, তা কি কখনো সহ্য করেছ। তা যদি করে থাকো তবে বলো দেখি স্ত্রীলোকের কষ্ট দেখলে সেইরূপ কষ্ট হয় কি না।"

নরেন্দ্রের সম্মুখে এতগুলি প্রশ্ন একে একে খাড়া হইল, নরেন্দ্র ভাবিয়া আকুল। অনেক ক্ষণের পর কহিলেন, "আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

গদাধরবাবু কহিলেন, "এখন কথা হচ্ছে যে, স্ত্রীলোকদের কষ্টমোচনে আমরা যদি দৃষ্টান্ত না দেখাই তবে কে দেখাইবে। এসো, আজ থেকেই এ বিষয়ের চেষ্টা করা যাক্‌।"

নরেন্দ্রের তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি মনে-মনে কেবল ভাবিতে লাগিলেন এখন কাহার অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিতে হইবে। গদাধরবাবু কহিলেন, "স্মরণ থাকতে পারে মোহিনী নামে এক বিধবার কথা সেদিন বলেছিলুম, আমাদের প্রথম পরীক্ষা তাহার উপর দিয়াই চলুক। এ বিষয়ে যা-কিছু বাধা আছে তা আলোচনা করে দেখা যাক। যেমন এক একটা পোষা পাখি শৃঙ্খলমুক্ত হলেও স্বাধীনতা পেতে চায় না, তেমনি সেই বিধবাটিও স্বাধীনতার সহস্র উপায় থাকিতেও অন্তঃপুরের কারাগার হইতে মুক্ত হইতে চায় না। সুতরাং আমাদের প্রথম কর্তব্যতাহাকে স্বাধীনতার সুমিষ্ট আস্বাদ জানাইয়া দেওয়া।"

নরেন্দ্র কহিলেন সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে এ বিষয়ে কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। সে বিধবার ভরণপোষণ বাসস্থান ইত্যাদি সমুদয় বন্দোবস্তের ভার নরেন্দ্র নিজ স্কন্ধে লইতে স্বীকৃত হইলেন। ক্রমে ত্রিভঙ্গচন্দ্র বিশ্বম্ভর ও জন্মেজয়বাবু আসিলেন, ক্রমে সন্ধ্যাও হইল, প্লেট আসিল, বোতল আসিল। গদাধরবাবু স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়া ও স্বরূপবাবু জ্যোৎস্না-রাত্রির বিষয়ে নানাবিধ কবিতাময় উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, ত্রিভঙ্গচন্দ্র ও বিশ্বম্ভরবাবু স্খলিত স্বরে গান জুড়িয়া দিলেন, নরেন্দ্র ও জন্মেজয় কাহাকে যে গালাগালি দিতে লাগিলেন বুঝা গেল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র

মহেন্দ্র এত দিন বেশ ভালো ছিল। ইস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে, কলেজে এলে, বি.এ. পাস করিয়াছে, মেডিকাল কলেজে তিন চার বৎসর পড়িয়াছে, আর কিছু দিন পড়িলেই পাস হইত--কিন্তু বিবাহ হওয়ার পর হইতেই অমন হইয়া গেল কেন। আমাদের সঙ্গে আর দেখা করিতে আসে না, আমরা গেলে ভালো করিয়া কথা কয় না--এ-সব তো ভালো লক্ষণ নয়। সহসা এরূপ পরিবর্তন যে কেন হইল আমরা ভিতরে ভিতরে তাহার সন্ধান লইয়াছি। মূল কথাটা এই, কন্যাকর্তাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া মহেন্দ্রের পিতা যে কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন তাহা মহেন্দ্রের বড়ো মনোনীত হয় নাই। মনোনীত না হইবারই কথা বটে। তাহার নাম রচনী ছিল, বর্ণও রজনীর ন্যায় অন্ধকার ; তাহার গঠনও যে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল তাহা নয় ; কিন্তু মুখ দেখিলে তাহাকে অতিশয় ভালো মানুষ বলিয়া বোধ হয়। বেচারি কখনো কাহারো কাছে আদর পায় নাই, পিত্রালয়ে অতিশয় উপেক্ষিত হইয়াছিল। বিশেষত তাহার রূপের দোষে বর পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যাহার তাহার কাছে তাহাকে নিগ্রহ সহিতে হইত। কখনো কাহারো সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করে নাই। একদিন আয়না খুলিয়া কপালে টিক পরিতেছিল বলিয়া কত লোকে কত রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিল ; সেই অবধি উপহাসের ভয়ে বেচারি কখনো আয়নাও খুলে নাই, কখনো বেশভূষাও করে নাই। স্বামী-আলয়ে আসিল। সেখানে স্বামীর

নিকট হইতে এক মুহূর্তের নিমিত্তও আদর পাইল না, বিবাহরাত্রের পরদিন হইতে মহেন্দ্র তাহার কাছে শুইত না। এ দিকে মহেন্দ্র এমন বিদ্বান, এমন মৃদুস্বভাব, এমন সদ্‌বন্ধু ছিল, এমন আমোদদায়ক সহচর ছিল, এমন সহৃদয় লোক ছিল যে, সেও সকলকে ভালোবাসিত, তাহাকেও সকলে ভালোবাসিত। রজনীর কপালদোষে সে মহেন্দ্রও বিগড়াইয়া গেল। মহেন্দ্র পিতাকে কখনো অভক্তি করে নাই, কিন্তু বিবাহের পরদিনেই পিতাকে যাহা বলিবার নয় তাহাই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে। পিতা ভাবিলেন--তাঁহারই বুঝিবার ভুল, কলেজে পড়িলেই ছেলেরা যে অবাধ্য হইয়া যাইবে ইহা তো কথাই আছে।

রজনীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। আমি মহেন্দ্রকে গিয়া বুঝাইলাম। আমি বলিলাম, 'রজনীর ইহাতে কী দোষ আছে। তাহার কুরূপের জন্য সে কিছু দোষী নহে, দ্বিতীয়তঃ তাহার বিবাহের জন্য তোমার পিতাই দোষী। তবে বিনা অপরাধে বেচারিকে কেন কষ্ট দাও।' মহেন্দ্র কিছুই বুঝিল না বা আমাকেও বুঝাইল না, কেবল বলিল তাহার অবস্থায় যদি পড়িতাম তবে আমিও ঐরূপ ব্যবহার করিতাম। এ কথা যে মহেন্দ্র অতি ভুল বুঝিয়াছিল তাহা বুঝাইবার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ আমার সহিত গল্পের অতি অল্পই সম্বন্ধ আছে।

এ সময়ে মহেন্দ্রের কলেজ ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় নাই। পোড়ো জমিতে কাঁটাগাছ জন্মায়, অব্যবহৃত লৌহে মরিচা পড়ে, মহেন্দ্র এমন অবস্থায় কাজকর্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে অনেক কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি আপনি মহেন্দ্রের কাছে গেলাম, সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম, মহেন্দ্র বিরক্ত হইল, আমি আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম।

একটা-কিছু আমোদ নহিলে কি মানুষ বাঁচিতে পারে। মহেন্দ্র যেরূপ কৃতবিদ্য, লেখাপড়ায় সে তো অনেক আমোদ পাইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা দিয়া দিয়া বইগুলার উপর মহেন্দ্রের এমন একটা অরুচি জন্মিয়াছে যে, কলেজ হইতে টাটকা বাহির হইয়াই আর-একটা কিছু নূতন আমোদ পাইলেই তাহার পক্ষে ভালো হইত। মহেন্দ্র এখন একটু-আধটু করিয়া শেরী খায়। কিন্তু তাহাতে কী হানি হইল। কিন্তু হইল বৈকি। মহেন্দ্রও তাহা বুঝিত--এক-একবার বড়ো ভয় হইত, এক-একবার অনুতাপ করিত, এক-একবার প্রতিজ্ঞা করিত, আবার এক-একদিন খাইয়াও ফেলিত এবং খাইবার পক্ষে নানাবিধ যুক্তিও ঠিক করিত। ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্র অধোগতির গহ্বরে এক-এক সোপান করিয়া নাবিতে লাগিলেন। মদ্যটা মহেন্দ্রের এখন খুব অভ্যস্ত হইয়াছে। আমি কখনো জানিতাম না এমন-সকল সামান্য বিষয় হইতে এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটিতে পারে। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে সেই ভালো মানুষ মহেন্দ্র, স্কুলে যে ধীরে ধীরে কথা কহিত, মৃদু মৃদু হাসিত, অতি সন্তর্পণে চলাফিরা করিত, সে আজ মাতাল হইয়া অমন যা-তা বকিতে থাকিবে, সে অমন বৃদ্ধ পিতার মুখের উপর উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে। সর্বাপেক্ষা অসম্ভব মনে করিতাম যে, ছেলেবেলা আমার সঙ্গে মহেন্দ্রের এত ভাব ছিল, সে আজ আমাকে দেখিলেই বিরক্ত হইবে, আমাকে দেখিলেই ভয় করিবে যে 'বুঝি ঐ আবার লেক্‌চার দিতে আসিয়াছে'। কিন্তু আমি আর তাহাকে কিছু বুঝাইতে যাইতাম না। কাজ কী। কথা মানিবে না যখন, কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র, তখন তাহাকে বুঝাইয়া আর কী করিব। কিন্তু তাহাও বলি, মহেন্দ্র হাজার মাতাল হউক তাহার অন্য কোনো দোষ ছিল না, আপনার ঘরে বসিয়াই মাতাল হইত, কখনো ঘরের বাহির হইত না। কিন্তু অল্প দিন হইল মহেন্দ্রের চাকর শম্ভু আসিয়া আমাকে কহিল যে, বাবু বিকাল হইলে বাহির হইয়া যান আর অনেক রাত্রি হইলে বাড়ি ফিরিয়া আসেন। এই কথা শুনিয়া আমার বড়ো কষ্ট হইল, খোঁজ লইলাম, দেখিলাম দূষ্য কিছু নয়--মহেন্দ্র তাহাদের বাগানের ঘাটে বসিয়া থাকে। কিন্তু তাহার কারণ কী। এখনো তো বিশেষ কিছু সন্ধান পাই নাই।

সংস্কারক মহাশয় যে বিধবা মোহিনীর কথা বলিতেছিলেন, সে মহেন্দ্রের বাড়ির পাশেই থাকিত। মহেন্দ্রের বাড়িও আসিত, মহেন্দ্রও রোগ-বিপদে সাহায্য করিতে তাহাদের বাড়ি যাইত। মোহিনীকে দেখিতে বেশ ভালো ছিল--কেমন উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন প্রফুল্ল ওষ্ঠাধর, সমস্ত মুখের মধ্যে কেমন একটি মিষ্ট ভাব ছিল, তাহা বলিবার নয়।

যাহা হউক, মোহিনীকে স্বাধীনতার আলোকে আনিবার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র চলিতেছে।
মোহিনীকে একাদশী করিতে হয়, মোহিনী মাছ খাইতে পায় না, মোহিনীর প্রতি সমাজের এই-সকল অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া গদাধরবাবু অত্যন্ত কাতর আছেন। স্বরূপবাবু মোহিনীর উদ্দেশে নানা সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রিকায় নানাবিধ প্রেমের কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের বাংলা সমাজকে ও দেশাচারকে অনেক গালি দিলেন ও অবশেষে সমস্ত মানবজাতির উপর বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজে বড়ো বিষণ্ন হইয়া গেলেন ও সমস্ত দিন রাত্রি অনেক নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।
নরেন্দ্রের কাশীপুরস্থ বাগানের পাশেই মোহিনীর বাড়ি। যে ঘাটে মোহিনী জল আনিতে যাইত, নরেন্দ্র সেখানে দিন কতক আনাগোনা করিতে লাগিলেন। এইসকল দেখিয়া মোহিনী বড়ো ভালো বুঝিল না, সে আর সে ঘাটে জল আনিতে যাইত না। সে তখন হইতে মহেন্দ্রের বাগানের ঘাটে জল তুলিতে ও স্নান করিতে যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিনীর ও মহেন্দ্রের মনের কথা

'এমন করিলে পারিয়া উঠা যায় না। মহেন্দ্রের বাড়ি ছাড়িয়া দিলাম--ভাবিলাম দূর হোক্ গে, ও দিকে আর মন দিব না। মহেন্দ্র আমাদের বাড়িতে আসিলে আমি রান্নাঘরে গিয়া লুকাইতাম, কিন্তু আজকাল মহেন্দ্র আবার ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকে, কী দায়েই পড়িলাম, তাহার জন্য জল আনা বন্ধ হইবে নাকি। আচ্ছা, নাহয় ঘাটেই বসিয়া থাকিল, কিন্তু অমন করিয়া তাকাইয়া থাকে কেন। লোকে কী বলিবে। আমার বড়ো লজ্জা করে। মনে করি ঘাটে আর যাইব না, কিন্তু না যাইয়া কী করি। আর কেনই বা না যাইব। সত্য কথা বলিতেছি, মহেন্দ্রকে দেখিলে আমার নানান ভাবনা আইসে, কিন্তু সে-সব ভাবনা ভুলিতেও ইচ্ছা করে না। বিকাল বেলা একবার যদি মহেন্দ্রকে দেখিতে পাই তাহাতে হানি কী। হানি হয় হউক গে, আমি তো না দেখিয়া বাঁচিব না। কিন্তু মহেন্দ্রকে জানিতে দিব না যে তাহাকে ভালোবাসি, তাহা হইলে সে আমার প্রতি যাহা খুশি তাহাই করিবে। আর এ-সকল ভালোবাসাবাসির কথা রাষ্ট্র হওয়াও কিছু নয়'--এই তো গেল মোহিনীর মনের কথা।
মহেন্দ্র ভাবে--'আমি তো রোজ ঘাটে বসিয়া থাকি, কিন্তু মোহিনী তো একদিনও আমার দিকে ফিরিয়া চায় না। আমি যে দিকে থাকি, সে দিক দিয়াও যায় না, আমাকে দেখিলে শশব্যস্তে ঘোমটা টানিয়া দেয়, পথে আমাকে দেখিলে প্রান্তভাগে সরিয়া যায়, মোহিনীর বাড়িতে গেলে কোথায় পলাইয়া যায়--এমন করিলে বড়ো কষ্ট হয়। আগে জানিতাম মোহিনী আমাকে ভালোবাসে। ভালো না বাসুক, যত্ন করে। কিন্তু আজকাল অমন করে কেন। এ কথা মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিতে কী দোষ আছে। মোহিনীকে তো আমি কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। মোহিনীর বাড়ির সকলে আমাকে এত ভালোবাসে যে, মোহিনীর সহিত কথাবার্তা কহিলে কেহ তো কিছু মনে করে না।'
একদিন বিকালে মোহিনী জল তুলিতে আসিল। মহেন্দ্র যেমন ঘাটে বসিয়া থাকিত, তেমনি বসিয়া আছে। বাগানে আর কেহ লোক নাই। মোহিনী জল তুলিয়া চলিয়া যায়। মহেন্দ্র কম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে ডাকিল, 'মোহিনী!' মোহিনী যেন শুনিতে পাইল না, চলিয়া গেল। মহেন্দ্র ফিরিয়া আর ডাকিতে সাহস করিল না। আর-একদিন মোহিনী বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে, মহেন্দ্র সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ; মোহিনী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল। মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘর্মাক্তললাট হইয়া কত কথা কহিল, কত কথা বাধিয়া গেল, কোনো কথাই ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিল না।
মোহিনী শশব্যস্তে কহিল, "সরিয়া যান, আমি জল লইয়া যাইতেছি।"
সেই দিন মহেন্দ্র বাড়ি গিয়াই একটা কী সামান্য কথা লইয়া পিতার সহিত ঝগড়া করিল, নির্দোষী রজনীকে অকারণ অনেকক্ষণ ধরিয়া তিরস্কার করিল, শম্ভু চাকরটাকে দুই-তিন বার মারিতে উদ্যত হইল ও মদের মাত্রা আরো খানিকটা বাড়াইল। কিছু দিনের মধ্যে গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের

আলাপ হইল, তাহার দিন চারেক পরে স্বরূপবাবুর সহিত সখ্যতা জন্মিল, তাহার সপ্তাহ খানেক পরে নরেন্দ্রের সহিত পরিচয় হইল ও মাসেকের মধ্যে মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সভায় সন্ধ্যাগমে নিত্য অতিথিরূপে হাজির হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতমহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ

পূর্বে রঘুনাথ সার্বভৌম মহাশয়ের একটি টোল ছিল। অর্থাভাবে অল্প দিনেই টোলটি উঠিয়া যায়। গ্রামের বর্ধিষ্ণু জমিদার অনূপকুমার যে পাঠশালা স্থাপন করেন, অল্প বেতনে তিনি তাহার গুরুমহাশয়ের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু গুরুমহাশয়ের পদে আসীন হইয়া তাঁহার শান্তপ্রকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয় বলিতেন, তাঁহার বয়স সবে চল্লিশ বৎসর। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শপথ করিয়া বলা যায় তাঁহার বয়স আটচল্লিশ বৎসরের ন্যূন নয়। সাধারণ পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার আর কোনো বিষয় মিল ছিল না--তিনি খুব টস্‌টসে রসিক পুরুষ ছিলেন না বা খট্‌খটে ঘট-পট-বাগীশ ছিলেন না, দলাদলির চক্রান্ত করিতেন না, শাস্ত্রের বিচার লইয়া বিবাদে লিপ্ত থাকিতেন না, বিদায়-আদায়ের কোনো আশাই রাখিতেন না। কেবল মিল ছিল প্রশস্ত উদরটিতে, নস্যের ডিবাটিতে, ক্ষুদ্র টিকিটিতে ও শ্মশ্রুবিহীন মুখে। পাঠশালার বালকেরা প্রায় চব্বিশ ঘন্টা তাঁহার বাড়িতেই পড়িয়া থাকিত। এই বালকদের জন্য তাঁহার অনেক সন্দেশ খরচ হইত ; সন্দেশের লোভ পাইয়া বালকেরা ছিনা জোঁকের মতো তাঁহার বাড়ির মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। পণ্ডিতমশাই বড়োই ভালোমানুষ ছিলেন এবং দুষ্ট বালকেরা তাঁহার উপর বড়োই অত্যাচার করিত। পণ্ডিতমহাশয়ের নিদ্রাটি এমন অভ্যস্ত ছিল যে, তিনি শুইলেই ঘুমাইতেন, বসিলেই ঢুলিতেন ও দাঁড়াইলেই হাই তুলিতেন। এই সুবিধা পাইয়া বালকেরা তাঁহার নস্যের ডিবা, চটিজুতা ও চশমার ঠুঙিটি চুরি করিয়া লইত। একে তো পণ্ডিতমহাশয় অতিশয় আলগা লোক, তাহাতে পাঠশালার দুষ্ট বালকেরা তাঁহার বাটীতে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা রাখিত না। পাঠশালায় যাইবার সময় কোনোমতে তাঁহার চটিজুতা খুঁজিয়া পাইতেন না, অবশেষে শূন্যপদেই যাইতেন। একদিন সকালে উঠিয়া দৈবাৎ দেখিতে পাইলেন তাঁহার শয়নগৃহে বোলতায় চাক করিয়াছে, ভয়ে বিব্রত হইয়া সে ঘরই পরিত্যাগ করিলেন ; সে ঘরে তিন পরিবার বোলতায় তিনটি চাক বাঁধিল, ইঁদুরে গর্ত করিল, মাকড়সা প্রাসাদ নির্মাণ করিল এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পিপীলিকা সার বাঁধিয়া গৃহময় রাজপথ বসাইয়া দিল। বালীর পক্ষে ঋষ্যমুখ পর্বত যেরূপ, পণ্ডিতমহাশয়ের পক্ষে এই ঘরটি সেরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠশালায় গমনে অনিচ্ছুক কোনো বালক যদি সেই গৃহে লুকাইত তবে আর পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে ধরিতে পারিতেন না।

গৃহের এইরূপ আলগা অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয় অনেক দিন হইতে একটি গৃহিণীর চিন্তায় আছেন। পূর্বকার গৃহিণীটি বড়ো প্রচণ্ড স্ত্রীলোক ছিলেন। নিরীহপ্রকৃতি সার্বভৌম মহাশয় দিল্লীশ্বরের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। স্ত্রী নিকটে থাকিলে অন্য স্ত্রীলোক দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকিতেন। একবার একটি অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার দিকে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পত্নী সেই বালিকাটির মৃত পিতৃপিতামহ প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া যথেষ্ট গালি বর্ষণ করেন ও সার্বভৌমমহাশয়ের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'তুমি মরো, তুমি মরো, তুমি মরো !' পণ্ডিতমহাশয় মরণকে বড়ো ভয় করিতেন, মরণের কথা শুনিয়া তাঁহার বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতে লাগিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দৈনিক গালি না পাইয়া অভ্যাসদোষে দিনকতক বড়ো কষ্ট অনুভব করিতেন। যাহা হউক, অনেক কারণে পণ্ডিতমহাশয় বিবাহের চেষ্টায় আছেন। পণ্ডিতমহাশয়ের একটা কেমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি সহস্রমিষ্টান্নের লোভ পাইলেও কাহারো বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিতেন না। কাহারো বিবাহের সংবাদ শুনিলে সমস্ত দিন মন খারাপ হইয়া থাকিত। পণ্ডিতমহাশয়ের এক

ভট্টাচার্যবন্ধু ছিলেন ; তাঁহার মনে ধারণা ছিল যে তিনি বড়োই রসিক, যে ব্যক্তি তাঁহার কথা শুনিয়া না হাসিত তাহার উপরে তিনি আন্তরিক চটিয়া যাইতেন। এই রসিক বন্ধু মাঝে মাঝে আসিয়া ভট্টাচার্যীয় ভঙ্গি ও স্বরে সার্বভৌম মহাশয়কে কহিতেন, "ওহে ভায়া, শাস্ত্রে আছে--যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধোভবেৎ পুমান্।

যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহম্।

কিন্তু তোমাতে তদ্‌বৈপরীত্যই লক্ষিত হচ্ছে। কারণ কিনা, যখন তোমার ব্রাহ্মণী বিদ্যমান ছিলেন তখন তুমি ভয়ে আশঙ্কায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিলে, স্ত্রীবিয়োগের পর আবার দেখতে দেখতে শরীর দ্বিগুণ হয়ে উঠল। অপরন্তু শাস্ত্রে যে লিখছে বালকের দ্বারা পরিবৃত না হইলে গৃহ শ্মশানসমান হয়, কিন্তু বালক-কর্তৃক পরিবৃত হওয়া প্রযুক্তই তোমার গৃহ শ্মশানসমান হয়েছে।"

এই বলিয়া সমীপস্থ সকলকে চোখ টিপিতেন ও সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিলে পর তিনি সন্তোষের সহিত মুহুর্‌মুহু নস্য লইতেন।

ও পারের একটি মেয়ের সঙ্গে সার্বভৌম মহাশয়ের সম্বন্ধ হইয়াছে। এ কয়দিন পণ্ডিতমহাশয় বড়ো মনের স্ফূর্তিতে আছেন। পাঠশালায় ছুটি হইয়াছে। আজ পাত্র দেখিতে আসিবে, পাড়ার কোনো দুষ্ট লোকের পরামর্শ শুনিয়া পণ্ডিতমহাশয় নরেন্দ্রের নিকট হইতে এক জোড়া ফুল মোজা, জরির পোশাক ও পাগড়ি চাহিয়া আনিলেন। পাড়ার দুষ্ট লোকেরা এই সকল বেশ পরাইয়া তাঁহাকে সঙ সাজাইয়া দিল। ক্ষুদ্রপরিসর পাগড়িটি পণ্ডিতমহাশয়ের বিশাল মস্তকের টিকির অংশটুকু অধিকার করিয়া রহিল মাত্র, চার পাঁচটা বোতাম ছিড়িয়া কষ্টে-সৃষ্টে পণ্ডিতমহাশয়ের উদরের বেড়ে চাপকান কুলাইল। অনেক ক্ষণের পর বেশভূষা সমাপ্ত হইলে পর সার্বভৌম মহাশয় দর্পণে একবার মুখ দেখিলেন। জরির পোশাকের চাকচিক্য দেখিয়া তাঁহার মন বড়ো তৃপ্ত হইল। কিন্তু সেই ঢলঢলে জুতা পরিয়া, আঁট সাঁট চাপকান গায়ে দিয়া চলিতেও পারেন না, নড়িতেও পারেন না, জড়ভরতের মতো এক স্থানে বসিয়াই রহিলেন। মাথা একটু নিচু করিলেই মনে হইতেছে পাগড়ি বুঝি খসিয়া পড়িবে। ঘাড়-বেদনা হইয়া উঠিল, তথাপি যথাসাধ্য মাথা উঁচু করিয়া রাখিলেন। ঘন্টাখানেক এইরূপ বেশে থাকিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল, অনর্গল ঘর্ম প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। পল্লীর ভদ্রালাকেরা আসিয়া অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তাঁহার বেশ পরিবর্তন করাইল।

ভট্টাচার্যমহাশয় তাঁহার অব্যবস্থিত গৃহ পরিস্কৃত ও সজ্জিত করিবার নিমিত্ত নানা খোশামোদ করিয়া নিধিরাম ভট্টকে আহ্বান করিয়াছেন। এই নিধিরামের উপর পণ্ডিতমহাশয়ের অতিরিক্ত ভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, গার্হস্থ্য ব্যাপারে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে নিধি তাঁহার পুরাতন গৃহিণীর সমান, মকদ্দমার নানাবিধ জটিল তর্কে সে স্বয়ং-মেজেস্টোর সায়েবকেও ঘোল পান করাইতে পারে এবং সকল বিষয়ের সংবাদ রাখিতে ও চতুরতাপূর্বক সকল কাজ সম্পন্ন করিতে সে কালেজের ছেলেদের সমানই হউক বা কিছু কমই হউক।

চতুরতাভিমানী লোকেরা আপনার অভাব লইয়া গর্ব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য ব্যবস্থার চতুরতা জানাইতে চায় সে আপনার দারিদ্র্য লইয়া গর্ব করে, অর্থাৎ 'অর্থের অভাব সত্ত্বেও কেমন সুচারুরূপে সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেছি।'। নিধি তাঁহার মূর্খতা লইয়া গর্ব করিতেন।

গল্পবাগীশ লোক মাত্রেই পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি বড়ো অনুকূল। কারণ, নীরবে সকল প্রকারের গল্প শুনিয়া যাইতে ও বিশ্বাস করিতে পল্লীতে পণ্ডিতমহাশয়ের মতো আর কেহই ছিল না। এই গুণে বশীভূত হইয়া নিধি মাসের মধ্যে প্রায় দুই শত বার করিয়া তাঁহার এক বিবাহের গল্প শুনাইতেন। গল্পের ডালপালা ছাঁটিয়া-ছুটিয়া দিলে সারমর্ম এইরূপ দাঁড়ায়--নিধিরাম ভট্ট বর্ণপরিচয় পর্যন্ত শিখিয়াই লেখাপড়ায় দাঁড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু চালাকির জোরে বিদ্যার অভাব পূরণ করিতেন। নিধির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু এমন শ্বশুর পৃথিবীতে নাই যে নিধির মতো গোমূর্খকে জানিয়া শুনিয়া কন্যা সম্প্রদান করে। অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে পাত্রী স্থির হইল। আজ জামাতাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। অদ্বিতীয় চতুর নিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পালকি আনাইল এবং চাপকান ও

শামলা পরিয়া গুটিকতক কাগজের তাড়া হাতে করিয়া কন্যা-কর্তাদিগের সম্মুখেই পালকিতে চড়িলেন। দাদা কহিলেন, 'ও নিধি, আজ যে তোমাকে দেখতে এয়েচেন।' নিধি কহিলেন, 'না দাদা, আজ সাহেব সকাল-সকাল আসবে, ঢের কাজ ঢের লেখাপড়া আছে, আজ আর হচ্ছে না।' কন্যাকর্তারা জানিয়া গেল যে, নিধি কাজ কর্ম করে, লেখাপড়াও জানে। তাহার পরদিনেই বিবাহ হইয়া গেল। নিধি ইহার মধ্যে একটি কথা চাপিয়া যায়, আমরা সেটি সন্ধান পাইয়াছি--পাড়ার একটি এন্‌ট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, 'যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্ কলেজে পড়, তবে বলিয়ো বিশপ্‌স্ কলেজে।' দৈবক্রমে বিবাহসভায় ঐ প্রশ্ন করায় নিধি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়াছিল বিষাক্ত কালেজে। ভাগ্যে কন্যাকর্তারা নিধির মূর্খতাকে রসিকতা মনে করে, তাই যে যাত্রায় সে মানে মানে রক্ষা পায়।

নিধি আসিয়াই মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। 'ওরে ও'--'ওরে তা'--এ ঘরে একবার, ও ঘরে একবার--এটা ওল্‌টাইয়া, ওটা পাল্‌টাইয়া--দুই একটা বাসন ভাঙিয়া, দুই-একটা পুঁথি ছিঁড়িয়া--পাড়া-সুদ্ধ তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। কোনো কাজই করিতেছেন না অথচ মহা গোল, মহা ব্যস্ত। চটিজুতা চট্ চট্ করিয়া এ ঘর ও ঘর, এ বাড়ি ও বাড়ি, এ পাড়া ও পাড়া করিতেছেন--কোনোখানেই দাঁড়াইতেছেন না, উর্ধ্বশ্বাসে ইহাকে দু-একটি উহাকে দুই-একটি কথা বলিয়া আবার সট্ সট্ করিয়া গুরুমহাশয়ের বাড়ি প্রবেশ করিতেছেন। ফলটা এই সন্ধ্যার সময় গিয়া দেখিব--সার্বভৌমমহাশয়ের বাড়ি যে-কে-সেই, তবে পূর্বে এক দিনে যাহা পরিষ্কৃত হইত এখন এক সপ্তাহেও তাহা হইবে না। যাহা হউক, গৃহ পরিষ্কার করিতে গিয়া একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল--ঝাঁটার আঘাতে, লোকজনের কোলাহলে, তিন-ঘর বোলতা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিধিরামের নাক মুখ ফুলিয়া উঠিল--চটি জুতা ফেলিয়া, টিকি উড়াইয়া, কোঁচার কাপড়ে পা জড়াইতে জড়াইতে, চৌকাঠে হুঁচুট খাইতে খাইতে, পণ্ডিতমহাশয়কে গালি দিতে দিতে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া বাড়ির ঘরে ঘরে বিশৃঙ্খল বোলতার দল উড়িয়া বেড়াইত। বেচারি পণ্ডিতমহাশয় দশ দিন আর অরক্ষিত গৃহে বোলতার ভয়ে প্রবেশ করেন নাই, প্রতিবাসীর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ও যাইবার সময় ঘটী ঘড়া ইত্যাদি যে-সকল দ্রব্য বাড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আসিবার সময় তাহা আর দেখিতে পাইলেন না।

অদ্য বিবাহ হইবে। পণ্ডিতমহাশয় কাল সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বহুকালের পুরানো সেই ঝাঁটাগাছটি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এটি তাঁহার শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হইল। হাসিতে হাসিতে প্রত্যুষেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। চেলীর জোড় পরিয়া চন্দনচর্চিত কলেবরে ভাবে ভোর হইয়া বসিয়া আছেন। থাকিয়া থাকিয়া সহসা পণ্ডিতমহাশয়ের মনে একটি দুর্ভাবনার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, সকলই তো হইল, এখন নৌকায় উঠিবেন কী করিয়া। অনেক ক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন ; বিশ-বাইশ ছিলিম তাম্রকূট ভস্ম হইলে ও দুই-এক ডিবা নস্য ফুরাইয়া গেলে পর একটা সদুপায় নির্ধারিত হইল। তিনি ঠিক করিলেন যে নিধিরামকে সঙ্গে লইবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিরাম সঙ্গে থাকিলে নৌকা ডুবিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। নিধির অন্বেষণে চলিলেন। সেদিনকার দুর্ঘটনার পরে নিধি 'আর পণ্ডিতমহাশয়ের বাড়িমুখা হইব না' বলিয়া স্থির করিয়াছিল, অনেক খোশামোদে স্বীকৃত হইল। এইবার নৌকায় উঠিতে হইবে। সার্বভৌমমহাশয় তীরে দাঁড়াইয়া নস্য লইতে লাগিলেন। আমাদের নিধিরামও নৌকাকে বড়ো কম ভয় করিতেন না, যদি কন্যাকর্তাদের বাড়িতে আহারের প্রলোভন না থাকিত তাহা হইলে প্রাণান্তেও নৌকায় উঠিতেন না। অনেক কষ্টে পাঁচ-ছয়-জন মাঝিতে ধরাধরি করিয়া তাঁহাদিগকে কোনোক্রমে তো নৌকায় তুলিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা যতই নড়েচড়ে পণ্ডিতমহাশয় ততই ছট্‌ফট্ করেন, পণ্ডিতমহাশয় যতই ছট্‌ফট্ করেন নৌকা ততই টল্‌মল্ করে ; মহা হাঙ্গাম, মাঝিরা বিব্রত, পণ্ডিতমহাশয় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন ও মাঝিদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, যদিই পাড়ি দিতে হইল তবে যেন ধার ধার দিয়া দেওয়া হয়। নিধিরামের মুখে কথাটি নাই। তিনি এমন অবস্থায় আছেন যে, একটু বাতাস উঠিলে বা

একটু মেঘ দেখা দিলেই নৌকার মাস্তুলটা লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। পণ্ডিতমহাশয় আকুল ভাবে নিধির মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। দুই-এক জায়গায় তরঙ্গবেগে নৌকা একটু টল্‌মল্‌ করিল, নিধি লাফাইয়া উঠিল, পণ্ডিতমহাশয় নিধিকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখনো তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে প্রাণহানির কোনো সম্ভাবনা নাই। নিধি সার্বভৌমমহাশয়ের বাহুপাশ ছাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতমহাশয় ততই প্রাণপণে আঁটিয়া ধরিতে লাগিলেন। শীর্ণকায় নিধি দারুণ নিষ্পেষণে রুদ্ধশ্বাস হইয়া যায় আর-কি, রোষে বিরক্তিতে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিতে করিতে নৌকা তীরে লাগিল। মাঝিরা এরূপ নৌকাযাত্রা আর কখনো দেখে নাই। তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কণ্ঠাগতপ্রাণ নিধি নিশ্বাস লইয়া বাঁচিলেন, পণ্ডিতমহাশয় এক ঘটী জল খাইয়া বাঁচিলেন।

বিবাহের সন্ধ্যা উপস্থিত। পণ্ডিতমহাশয় টিকিযুক্ত শিরে টোপর পরিয়া গদির উপর বসিয়া আছেন। অনাহারে, নৌকার পরিশ্রমে ও অভ্যাসদোষে দারুণ ঢুলিতেছেন। মাথার উপর হইতে মাঝে মাঝে টোপর খসিয়া পড়িতেছে। পার্শ্ববর্তী নিধি মাঝে মাঝে এক-একটি গুঁতা মারিতেছে ; সে এমন গুঁতা যে তাহাতে মৃত ব্যক্তিরও চৈতন্য হয়, সেই গুঁতা খাইয়া পণ্ডিতমহাশয় আবার ধড়্‌ফড়িয়া উঠিতেছেন ও শিরচ্যুত টোপরটি মাথায় পরিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে চারি দিক অবলোকন করিতেছেন, সভাময় চোখ-টেপাটেপি করিয়া হাসি চলিতেছে। লগ্ন উপস্থিত হইল, বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন, পুরোহিতটি তাঁহারই টোল-আউট শিষ্য। শিষ্য মহা লজ্জায় পড়িয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় কানে কানে কহিলেন, তাহাতে আর লজ্জা কী ! এবং লজ্জা করিবার যে কোনো প্রয়োজন নাই এ কথা তিনি স্কন্দ ও কল্পিপুরাণ হইতে উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্বভৌমমহাশয় বিবাহ-আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত মন্ত্র বলিবার সময় একটা ভুল করিল। সংস্কৃতে ভুল পণ্ডিতমহাশয়ের সহ্য হইল না, অমনি মুগ্ধবোধ ও পাণিনি হইতে গণ্ডা আষ্টেক সূত্র আওড়াইয়া ও তাহা ব্যাখ্যা করিয়া পুরোহিতের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। পুরোহিত অপ্রস্তুত হইয়া ও ভেবাচেকা খাইয়া আরো কতকগুলি ভুল করিল। পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন যে, তিনি টোলে তাহাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন পুরোহিত বাবাজি চাল-কলার সহিত তাহা নিঃশেষে হজম করিয়াছেন। বিবাহ হইয়া গেল। উঠিবার সময় সার্বভৌমমহাশয় কিরূপ বেগতিকে পায়ে পা জড়াইয়া তাঁহার শ্বশুরের ঘাড়ে পড়িয়া গেলেন, উভয়ে বিবাহসভায় ভূমিসাৎ হইলেন। বরের কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, টোপর ভাঙিয়া গেল। শ্বশুরের শূলবেদনা ছিল, স্থূলকায় ভট্টাচার্যমহাশয় তাঁহার উদর চাপিয়া পড়াতে তিনি বিষম চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সাত-আট জন ধরাধরি করিয়া উভয়কে তুলিল, সভাশুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল, পণ্ডিতমহাশয় মর্মান্তিক অপ্রস্তুত হইলেন ও দুই-একটি কী কথা বলিলেন তাহার অর্থ বুঝা গেল না। একবার দৈবাৎ অপ্রস্তুত হইলে পদে পদে অপ্রস্তুত হইতেই হইবে। অন্তঃপুরে গিয়া গোলেমালে পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার শাশুড়ির পা মাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার শাশুড়ি 'নাঃ--কিছু হয় নাই' বলিলেন ও অন্দরে গিয়া সিক্ত বস্ত্রখণ্ড তাঁহার পায়ের আঙুলে বাঁধিয়া আসিলেন। আহার করিবার সময় দৈবক্রমে গলায় জল বাধিয়া গেল, আধঘন্টা ধরিয়া কাশিতে কাশিতে নেত্র অশ্রুজলে ভরিয়া গেল। বাসর-ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা আরসুলা আসিয়া তাঁহার গায়ে উড়িয়া বসিল। অমনি লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া, হাত পা ছড়াইয়া, মুখ বিকটাকার করিয়া তাঁহার শালীদের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িলেন। আবার দুইটি-চারিটি কান-মলা খাইয়া ঠিক স্থানে আসিয়া বসিলেন। একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, স্ত্রী-আচার করিবার সময় পণ্ডিতমহাশয় এমন উপর্যুপরি হাঁচিতে লাগিলেন যে চারি দিকের মেয়েরা বিব্রত হইয়া পড়িল। বাসর-ঘরের বিপদ হইতে কী করিয়া উদ্ধার হইবেন এ বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয় অনেক ভাবিয়াছিলেন ; সহসা নিধিকে মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু নিধির বাসর-ঘরে যাইবার কোনো উপায় ছিল না। যাহা হউক, ভালোমানুষ বেচারি অতিশয় গোলে পড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দুটি-একটি কী কথার উত্তর দিতে গিয়া স্মৃতি ও বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এবং যখন তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করে, অনেক পীড়াপীড়ির পর গাহিয়াছিলেন 'কোথায় তারিণী মা গো বিপদে তারহ সুতে'।

এই তিনি মনের সঙ্গে গাহিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্যমহাশয় রাগিণীর দিকে বড়ো একটা নজর করেন নাই, যে সুরে তিনি পুঁতি পড়িতেন সেই সুরেই গানটি গাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, অনেক কষ্টে বিবাহরাত্রি অতিবাহিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র নরেন্দ্রদের দলে মিশিয়াছে বটে, কিন্তু এখনো মহেন্দ্রের আচার-ব্যবহারে এমন একটি মহত্ত্ব জড়িত ছিল যে, নরেন্দ্র তাহার সহিত ভালো করিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না। এমন-কি সে থাকিলে নরেন্দ্র কেমন একটা অসুখ অনুভব করিত, সে চলিয়া গেলে কেমন একটু শান্তিলাভ করিত। অলক্ষিতভাবে নরেন্দ্রের মন মহেন্দ্রের মোহিনীশক্তির পদানত হইয়াছিল।

মহেন্দ্র বড়ো মৃদুস্বভাব লোক--হাসিবার সময় মুচকিয়া হাসে, কথা কহিবার সময় মৃদুস্বরে কথা কহে, আবার অধিক লোকজন থাকিলে মূলেই কথা কহে না। সে কাহারও কথায় সায় দিতে হইলে 'হাঁ' বলিত বটে, কিন্তু সায় দিবার ইচ্ছা না থাকিলে 'হাঁ'ও বলিত না, 'না'ও বলিত না। এ মহেন্দ্র নরেন্দ্রের মনের উপর যে অমন আধিপত্য স্থাপন করিবে তাহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় বটে।

মহেন্দ্রের সহিত গদাধরের বড়ো ভাব হইয়াছিল। ঘরে বসিয়া উভয়ে মিলিয়া দেশাচারের বিরুদ্ধে নিদারুণ কাল্পনিক সংগ্রাম করিতেন। স্বাধীনবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গে মহেন্দ্র সংস্কারকমহাশয়ের সহিত উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন, কিন্তু বহুবিবাহনিবারণ-প্রসঙ্গে তাঁহার তেমন উৎসাহ থাকিত না। এ ভাবের তাৎপর্য যদিও গদাধরবাবু বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা এক রকম বুঝিয়া লইয়াছি।

গদাধর ও স্বরূপের সঙ্গে মহেন্দ্রের যেমন বনিয়া গিয়াছিল, এমন নরেন্দ্র ও তাহার দলবলের সহিত হয় নাই। মহেন্দ্র ইহাদের নিকট ক্রমে তাহার দুই-একটি করিয়া মনের কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে মোহিনীর সহিত প্রণয়ের কথাটাও অবশিষ্ট রহিল না। এই প্রণয়ের কথাটা শুনিয়া স্বরূপবাবু অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন মহেন্দ্র তাঁহার প্রণয়ের অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন ; অনেক দুঃখ করিয়া অনেক কবিতা লিখিলেন এবং আপনাকে একজন উপন্যাস নাটকের নায়ক কল্পনা করিয়া মনে-মনে একটু তৃপ্ত হইলেন।

গদাধর কোনো প্রকারে মোহিনীর পারিবারিক অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া তাহাকে মুক্ত বায়ুতে আনয়ন করিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। তিনি কহেন, গৃহ হইতে আমাদের স্বাধীনতা শিক্ষা করা উচিত, প্রথমে পারিবারিক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে শিখিলে ক্রমশ আমরা স্বাধীনতাপথে অগ্রসর হইতে পারিব। ইংরাজি শাস্ত্রে লেখে ঃ Charity begins at home। তেমনি গৃহ হইতে স্বাধীনতার শুরু। সংস্কারকমহাশয় নিজে বাল্যকাল হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিতেছেন। বারো বৎসর বয়সে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া তিনি গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হন, ষোলো বৎসর বয়সে শিক্ষকের সহিত বিবাদ করিয়া ক্লাস ছাড়িয়া আসেন, কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রীর সহিত মনান্তর হয় এবং তাঁহাকে তাঁহার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন এবং এইরূপে স্বাধীনতার সোপানে সোপানে উঠিয়া সম্প্রতি ত্রিশ বৎসর বয়সে নিজে সমস্ত কুসংস্কার ও প্রেজুডিসের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া অসভ্য বঙ্গদেশের নির্দয় দেশাচারসমূহকে বক্তৃতার ঝটিকায় ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন।

কিন্তু গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের মতের ঐক্য হইল না, এমন-কি মহেন্দ্র মনে-মনে একটু অসন্তুষ্ট হইল। গদাধর আর অধিক কিছু বলিল না ; ভাবিল, 'আরো দিনকতক যাক্, তাহার পরে পুনরায় এই কথা তুলিব।'

আরো দিনকতক গেল, মহেন্দ্র এখন নরেন্দ্রদের দলে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়াছে। মহেন্দ্রের মনে আর মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। গদাধর আর-একবার পূর্বকার কথা পাড়িল, মহেন্দ্রের তাহাতে কোনো আপত্তি হইল না।

মহেন্দ্রের নামে কলঙ্ক ক্রমে রাষ্ট্র হইতে লাগিল। কিন্তু মহেন্দ্রের হৃদয়ে এতটুকু লোকলজ্জা

অবশিষ্ট ছিল না যে, এই অপবাদে তাহার মন তিলমাত্র ব্যথিত হইতে পারে।
মহেন্দ্রের ভগিনী পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা ইহাতে কিছু কষ্ট পাইল বটে, কিন্তু হতভাগিনী রজনীর হৃদয়ে যেমন আঘাত লাগিল এমন আর কাহারো নয়। যখন মহেন্দ্র মদ খাইয়া এলোমেলো বকিতে থাকে তখন রজনীর কী মর্মান্তিক ইচ্ছা হয় যে, আর কেহ সেখানে না আসে। যখন মহেন্দ্র মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে আইসে রজনী তাহাকে কোনো ক্রমে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তখন তাহার কতই না ভয় হয় পাছে আর কেহ দেখিতে পায়। অভাগিনী মহেন্দ্রকে কোনো কথা বলিতে, পরামর্শ দিতে বা বারণ করিতে সাহস করিত না, তাহার যতদূর সাধ্য কোনোমতে মহেন্দ্রের দোষ আর কাহাকেও দেখিতে দিত না। মহেন্দ্রের অসম্বৃত অবস্থায় রজনীর ইচ্ছা করিত তাহাকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখে, যেন আর কেহ দেখিতে না পায়। কেহ তাহার সাক্ষাতে মহেন্দ্রের নিন্দা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না, অন্তরালে গিয়া ক্রন্দন করা ভিন্ন তাহার আর কোনো উপায় ছিল না। সে তাহার মহেন্দ্রের জন্য দেবতার কাছে কত প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু মহেন্দ্র তাহার মত্ত অবস্থায় রজনীর মরণ ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করে নাই। রজনী মনে মনে কহিত, 'রজনীর মরিতে কতক্ষণ, কিন্তু রজনী মরিলে তোমাকে কে দেখিবে।'
একদিন রাত্রি দুইটার সময় টলিতে টলিতে মহেন্দ্র ঘরে আসিয়া ভূমিতলে শুইয়া পড়িল। রজনী জাগিয়া জানালায় বসিয়া ছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বসিল। মহেন্দ্র তখন অচৈতন্য। রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কতক্ষণের পর মহেন্দ্রের মাথা কোলে তুলিয়া লইল। আর কখনো সে মহেন্দ্রের মাথা কোলে রাখে নাই ; সাহসে বুক বাঁধিয়া আজ রাখিল। একটি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। ভোরের সময় মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিল ; পাখা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল, 'এখানে কী করিতেছ। ঘুমাও গে না!' রজনী ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া গেল। মহেন্দ্র আবার ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতের রৌদ্র মুক্ত বাতায়ন দিয়া মহেন্দ্রের মুখের উপর পড়িল, রজনী আস্তে আস্তে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।
রজনী মহেন্দ্রকে যত্ন করিত, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে করিতে সাহস করিত না। সে গোপনে মহেন্দ্রের খাবার গুছাইয়া দিত, বিছানা বিছাইয়া দিত এবং সে অল্পস্বল্প যাহাকিছু মাসহারা পাইত তাহা মহেন্দ্রের খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিতেই ব্যয় করিত, কিন্তু এ-সকল কথা কেহ জানিতে পাইত না। গ্রামের বালিকারা, প্রতিবেশিনীরা, এত লোক থাকিতে নির্দোষী রজনীরই প্রতি কার্যে দোষারোপ করিত, এমন-কি বাড়ির দাসীরাও মাঝে মাঝে তাহাকে দুই-এক কথা শুনাইতে ত্রুটি করিত না, কিন্তু রজনী তাহাতে একটি কথাও কহিত না--যদি কহিতে পারিত তবে অত কথা শুনিতেও হইত না।
রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইবে। মেঘ করিয়াছে, একটু বাতাস নাই, গাছে গাছে পাতায় পাতায় হাজার হাজার জোনাকি-পোকা মিট্ মিট্ করিতেছে। মোহিনীদের বাড়িতে একটি মানুষ আর জাগিয়া নাই, এমন সময়ে তাহাদের খিড়কির দরজা খুলিয়া দুইজন তাহাদের বাগানে প্রবেশ করিল। একজন বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল, আর-একজন গৃহে প্রবেশ করিল। যিনি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন তিনি গদাধর, যিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন তিনি মহেন্দ্র। দুইজনেরই অবস্থা বড়ো ভালো নহে, গদাধরের এমন বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে তাহা বলিবার নহে এবং মহেন্দ্রের পথের মধ্যে এমন শয়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে কী বলিব। ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, গদাধর দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন। পরোপকারের জন্য কী কষ্ট না সহ্য করা যায়, এমন-কি, এখনই যদি বজ্র পড়ে গদাধর তাহা মাথায় করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এই কথাটা অনেকক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, এখনই তাহাতে তিনি প্রস্তুত নহেন ; বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবীর অনেক উপকার করিতে পারিবেন। বৃষ্টিবজ্রের সময় বৃক্ষতলে দাঁড়ানো ভালো নয় জানিয়া একটি ফাঁকা জায়গায় গিয়া বসিলেন, বৃষ্টি দ্বিগুণ বেগে পড়িতে লাগিল।
এ দিকে মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া মোহিনীর ঘরের দিকে চলিল, যতই সাবধান হইয়া চলে ততই খস্ খস্ শব্দ হয়। ঘরের সম্মুখে গিয়া আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা মারিল, ভিতর হইতে দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "মোহিনী! দেখ্ তো বিড়াল বুঝি!" দিদিমার গলা শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি সরিবার চেষ্টা

দেখিলেন। সরিতে গিয়া একরাশি হাঁড়ি-কলসীর উপর গিয়া পড়িলেন। হাঁড়ির উপর কলসী পড়িল, কলসীর উপর হাঁড়ি পড়িল এবং কলসী হাঁড়ি উভয়ের উপর মহেন্দ্র পড়িল। হাঁড়িতে কলসীতে, থালায় ঘটিতে দারুণ ঝন্ ঝন্ শব্দ বাধাইয়া দিল এবং কলসী হইতে ঘড় ঘড় শব্দে জল গড়াইতে লাগিল। বাড়ির ঘরে ঘরে 'কী হইল' 'কী হইল' শব্দ উপস্থিত হইল। মা উঠিলেন, পিসি উঠিলেন, দিদি উঠিলেন, খোকা কাঁদিয়া উঠিল, দিদিমা বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে পোড়ারমুখা বিড়ালের মরণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন--মোহিনী প্রদীপ হস্তে বাহিরে আসিল। দেখিল মহেন্দ্র ; তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া কহিল, "পালাও ! পালাও !"

মহেন্দ্র পলাইবার উদ্যোগ করিল ও মোহিনী তাড়াতাড়ি প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিল। দিদিমা চক্ষে কম দেখিতেন বটে, কিন্তু কানে বড়ো ঠিক ছিলেন। মোহিনীর কথা শুনিতে পাইলেন, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "কাহাকে পলাইতে বলিতেছিস মোহিনী।"

দিদিমা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু পলায়নের ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ শুনিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে বাড়িসুদ্ধ লোক জমা হইল।

মহেন্দ্র তো অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিল। এ দিকে গদাধর বাগানে বসিয়া ভিজিতেছিলেন, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিতেই শুইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন তিনি বক্তৃতা করিতেছেন, আর হাততালির ধ্বনিতে সভা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, সভায় গভর্নর জেনেরাল উপস্থিত ছিলেন, তিনি বক্তৃতা-অন্তে পরম তুষ্ট হইয়া আপনি উঠিয়া শেক্‌হ্যান্ড্ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে দারুণ এক লাঠির আঘাত লাগিল। ধড়্ফড়িয়া উঠিলেন ; একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কী করিতেছিস। কে তুই।"

গদাধর জড়িত স্বরে কহিলেন, "দেশ ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রাণ দেওয়া সকল মনুষ্যেরই কর্তব্য। ডাল ও ভাত সঞ্চয় করাই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা গলায় দড়ি দিয়া মরিলেও পৃথিবীর কোনো অনিষ্ট হয় না। দেশ-সংস্কারের জন্য রাত্রি নাই, দিবা নাই, আপনার বাড়ি নাই, পরের বাড়ি নাই, সকল সময়ে সর্বত্রই কোনো বাধা মানিবে না, কোনো বিঘ্ন মানিবে না--কেবল ঐ উদ্দেশ্যস াধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। যে না করে সে পশু, সে পশু ! অতএব"--

আর অধিক অগ্রসর হইতে হইল না ; প্রহারের চোটে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, আর অল্পক্ষণ থাকিলে শরীর-সংস্কারের আবশ্যকতা হইত। অতিশয় বাড়াবাড়ি দেখিয়া গদাধর বক্তৃতা-ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া গোঙানিচ্ছন্দে তাঁহার মৃত পিতা, মাতা, কনেস্টেবল, পুলিস ও দেশের লোককে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। তাহারা বুঝিল যে, অধিক গোলযোগ করিলে তাহাদেরই বাড়ির নিন্দা হইবে, এইজন্য আস্তে আস্তে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল।

মোহিনীর উপরে তাহার বাড়িসুদ্ধ লোকের বড়োই সন্দেহ হইল। রাত্রে কে আসিয়াছিল এবং কাহাকে সে পলাইতে কহিল, এই কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য তাহার প্রতি দারুণ নিগ্রহ আরম্ভ হইল, কিন্তু সে কোনোমতে কহিল না। কিন্তু এ কথা ছাপা থাকিবার নহে। মহেন্দ্র পলাইবার সময় তাহার চাদর ও জুতা ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সকলে বুঝিতে পারিল যে মহেন্দ্রেরই এই কাজ। এই তো পাড়াময় ঢী ঢী পড়িয়া গেল ! পুকুরের ঘাটে, গ্রামের পথে, ঘরের দাওয়ায়, বৃদ্ধদের চণ্ডীমণ্ডপে এই এক কথারই আলোচনা হইতে লাগিল। মোহিনীর ঘর হইতে বাহির হওয়া দায় হইল, সকলেই তাহার পানে কটাক্ষ করিয়া কথা কয়। না কহিলেও মনে হয় তাহারই কথা হইতেছে। পথে কাহারো হাস্যমুখ দেখিলে তাহার মনে হইত তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসি তামাসা চলিতেছে। অথচ মোহিনীর ইহাতে কোনো দোষ ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র যখন বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন তখনো অনেক রাত আছে। নেশা অনেক ক্ষণ ছুটিয়া গেছে। মহেন্দ্রের মনে এক্ষণে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। ঘৃণায় লজ্জায় বিরক্তিতে ম্রিয়মাণ হইয়া শুইয়া

পড়িল। একে একে কত কী কথা মনে পড়িতে লাগিল ; শৈশবের এক-একটি স্মৃতি বজ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। যৌবনের নবোন্মেষের সময় ভবিষ্যৎ-জীবনের কী মধুময় চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল--কত মহান আশা, কত উদার কল্পনা তাঁহার উদ্দীপ্ত হৃদয়ের শিরায় শিরায় জড়িত বিজড়িত ছিল। যৌবনের সুখস্বপ্নে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম মাতৃভূমির ইতিহাসে গৌরবের অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাঁহার জীবন তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতাদের আদর্শস্বরূপ হইবে এবং ভবিষ্যৎকালে আদরে তাঁহার যশ বক্ষে পোষণ করিতে থাকিবে। কিন্তু সে হৃদয়ের, সে আশার, সে কল্পনার আজ কী পরিণাম হইল। তঁহার যশ কলঙ্কিত হইয়াছে, চরিত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে, হৃদয় দারুণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কালি হইতে তাঁহাকে দেখিলে গ্রামের কুলবধূগণ সংকোচে সরিয়া যাইবে, বন্ধুরা লজ্জায় নতশির হইবে, শত্রুদের অধর ঘৃণার হাস্যে কুটিল হইবে, বৃদ্ধেরা তাঁহার শৈশবের এই অনপেক্ষিত পরিণামে দুঃখ করিবে, যুবকেরা অন্তরালে তাঁহার নামে তীব্র উপহাস বিদ্রূপ করিবে--সর্বাপেক্ষা, তিনি যে নিরপরাধিনী বিধবার পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিলেন তাহার আর মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। মহেন্দ্র মর্মভেদী কষ্টে শয্যায় পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।
মহেন্দ্রের রোদন দেখিয়া রজনীর কি কষ্ট হইতে লাগিল, রজনীই তাহা জানে। মনে-মনে কহিল, 'তোমার কী হইয়াছে বলো, যদি আমার প্রাণ দিলেও তাহার প্রতিকার হয় তবে আমি তাহাও দিব।' রজনী আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিল। কত বার মনে করিল যে, পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে, কী হইয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া পারিল না, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।
মহেন্দ্র মনের আবেগে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া গেল। রজনী ভাবিল সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র চলিয়া গেল। আর থাকিতে পারিল না ; কাতর স্বরে কহিল, "আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি শোও !"
মহেন্দ্র তাহার কিছুই উত্তর না দিয়া অন্যমনে চলিয়া গেল।
ধীরে ধীরে বাতায়নে গিয়া বসিল। তখন মেঘমুক্ত চতুর্থীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। বাতায়নের নিম্নে পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ধারের পরস্পরসংলগ্ন অন্ধকার নারিকেলকুঞ্জের মস্তকে অস্ফুট জ্যোৎস্নার রজতরেখা পড়িয়াছে। অস্ফুট জ্যোৎস্নায় পুষ্করিণীতীরের ছায়াময় অন্ধকার গম্ভীরতর দেখাইতেছে। জ্যোৎস্নাময় গ্রাম যতদূর দেখা যাইতেছে, এমন শান্ত, এমন পবিত্র, এমন ঘুমন্ত যে মনে হয় এখানে পাপ তাপ নাই, দুঃখ যন্ত্রণা নাই--এক স্নেহহাস্যময় জননীর কোলে যেন কতকগুলি শিশু এক সঙ্গে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। মহেন্দ্রের মন ঘোর উদাস হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল 'সকলেই কেমন ঘুমাইতেছে, কাহারো কোনো দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। কাল সকালে আবার নিশ্চিন্তভাবে উঠিবে, আপনার আপনার কাজকর্ম করিবে। কেহ এমন কাজ করে নাই যাহাতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে সে মুখ লুকাইয়া বাঁচে, এমন কাজ করে নাই যাহাতে প্রতি মুহূর্তে তীব্রতম অনুতাপে তাহার মর্মে মর্মে শেল বিদ্ধ হয়। আমিও যদি এইরূপ নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে পারিতাম, নিশ্চিন্তভাবে জাগিতে পারিতাম। আমার যদি মনের মতো বিবাহ হইত, গৃহস্থের মতো বিনা দুঃখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতাম, স্ত্রীকে কত ভালোবাসিতাম, সংসারের কত উপকার করিতাম ! কেমন সহজে দিনের পর রাত্রি, রাত্রের পর দিন কাটিয়া যাইত, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ও সমস্ত দিন ঘুমাইয়া এই বিরক্তিময় জীবন বহন করিতে হইত না। আহা--কেমন জ্যোৎস্না, কেমন রাত্রি, কেমন পৃথিবী ! আঁধার নারিকেলবৃক্ষগুলি মাথায় একটু একটু জ্যোৎস্না মাখিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া আছে ; যেন তাহাদের বুকের ভিতর কী একটি কথা লুকানো রহিয়াছে। তাহাদের আঁধার ছায়া আঁধার পুষ্করিণীর জলের মধ্যে নিদ্রিত।'
মহেন্দ্র কতক্ষণ দেখিতে লাগিল, দেখিয়া দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল--'আমার ভাগ্যে পৃথিবী ভালো করিয়া ভোগ করা হইল না।'
মহেন্দ্র সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিতে মনস্থ করিল, ভাবিল পৃথিবীতে যাহাকে ভালোবাসিয়াছে

সকলকেই ভুলিয়া যাইবে। ভাবিল সে এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো উপকার করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন হইতে পরোপকারের জন্য তাহার স্বাধীন জীবন উৎসর্গ করিবে। কিন্তু গৃহের জনীকে একাকিনী ফেলিয়া গেলে সে নিরপরাধিনী যে কষ্ট পাইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে। এ কথা ভাবিলে অনেকক্ষণ ভাবা যাইত, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাবিতে ইচ্ছা হইল না--ভাবিল না।

মহেন্দ্র তাহার নিজ দোষের যত-কিছু অপবাদ-যন্ত্রণা সমুদয় অভাগিনী রজনীকে সহিতে দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বায়ু স্তম্ভিত, গ্রামপথ আঁধার করিয়া দুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী স্তব্ধ-গম্ভীর-বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই আঁধার পথ দিয়া ঝটিকাময়ী নিশীথিনীতে বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র একখানি মেঘখণ্ডের ন্যায় মহেন্দ্র যে দিকে ইচ্ছা চলিতে লাগিলেন।

রজনী ভাবিল যে, সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র অন্যত্র চলিয়া গেল। বাতায়নে বসিয়া জ্যোৎস্নাসুপ্ত পুষ্করিণীর জলের পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

করুণা ভাবে এ কী দায় হইল, নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসে না কেন। অধীর হইয়া বাড়ির পুরাতন চাকরানি ভবির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র কেন আসিতেছেন না। সে হাসিয়া কহিল, সে তাহার কী জানে।

করুণা কহিল, "না, তুই জানিস।"

ভবি কহিল, "ওমা, আমি কী করিয়া বলিব।"

করুণা কোনো কথায় কর্ণপাত করিল না। ভবির বলিতেই হইবে নরেন্দ্র কেন আসিতেছে না। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়িতেও ভবির কাছে বিশেষ কোনো উত্তর পাইল না। করুণা অতিশয় বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি মঙ্গলবারের মধ্যে নরেন্দ্র না আসেন তবে তাহার যতগুলি পুতুল আছে সব জলে ফেলিয়া দিবে। ভবি বুঝাইয়া দিল যে, পুতুল ভাঙিয়া ফেলিলেই যে নরেন্দ্রের আসিবার বিশেষ কোনো সুবিধা হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহার কথা শুনে কে। না আসিলে ভাঙিয়া ফেলিবেই ফেলিবে।

বাস্তবিক নরেন্দ্র অনেক দিন দেশে আসে নাই। কিন্তু পাড়ার লোকেরা বাঁচিয়াছে, কারণ আজকাল নরেন্দ্র যখনই দেশে আসে তখনই গোটা দুই-তিন কুকুর এবং তদপেক্ষা বিরক্তিজনক গোটা দুই-চার সঙ্গী তাহার সঙ্গে থাকে। তাহারা দুই-তিন দিনের মধ্যে পাড়াসুদ্ধ বিব্রত করিয়া তুলে। আমাদের পণ্ডিতমহাশয় এই কুকুরগুলা দেখিলে বড়োই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

যাহা হউক, পণ্ডিতমহাশয়ের বিবাহের কথাটা লইয়া পাড়ায় বড়ো হাসিতামাসা চলিতেছে। কিন্তু ভট্টাচার্যমহাশয় বিশ বাইশ ছিলিম তামাকের ধুঁয়ায়, গোটাকতক নস্যের টিপে এব নবগৃহিণীর অভিমানকুঞ্চিত ভ্রূমেঘনিক্ষিপ্ত দুই-একটি বিদ্যুতালোকের আঘাতে সকল কথা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেন। নিধিরাম ব্যতীত পণ্ডিতমহাশয়কে বাটী হইতে কেহ বাহির করিতে পারিত না। পণ্ডিতমহাশয় আজকাল একখানি দর্পণ ক্রয় করিয়াছেন, চশমাটি সোনা দিয়া বাঁধাইয়াছেন, দূরদেশ হইতে সূক্ষ্মশুভ্র উপবীত আননয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কাত্যায়নী পাড়ার মেয়েদের কাছে গল্প করিয়াছে যে, মিন্‌সা নাকি আজকালে মৃদু হাসি হাসিয়া উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে রসিকতা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয়ের নামে পূর্বে কখনো এরূপ কথা উঠে নাই। আমরা পণ্ডিণমহাশয়ের রসিকতার যে দুই-একটা নিদর্শন পায়িাছি তাহার মর্মার্থ বুঝা আমাদের সাধ্য নহে। তাহার মধ্যে প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহংকার, প্রমা, অবিদ্যা, রজ্জুতে সর্পভ্রম, পর্বতোবহ্নিমান ধূমাৎ ইত্যাদি নানাবিধ দার্শনিক হাঙ্গামা আছে। পণ্ডিতমহাশয়ের বেদান্তসূত্র ও সাংখ্যের উপর মাকড়সায় জাল বিস্তার করিয়াছে, আজকালে জয়দেবের গীতগোবিন্দ লইয়া পণ্ডিতমহাশয় ভাবে ভরপুর হইয়া আছেন। এই তো গেল পণ্ডিতমহাশয়ের অবস্থা।

আর আমাদের কাত্যায়নী ঠাকুরানীটি দিন কতক আসিয়াই পাড়ার মেয়েমহল একেবারে সরগরম

করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মতো গল্পগুজব করিতে পাড়ায় আর কাহারো সামর্থ্য নাই। হাত-পা নাড়িয়া চোখ-মুখ ঘুরাইয়া চতুর্দশ ভুবনের সংবাদ দিতেন। একজন তাঁহার নিকট কলিকাতা শহরটা কী প্রকার তাহারই সংবাদ লইতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, সেখানে বড়ো বড়ো মাঠ, সায়েবরা চাষ করে, রাস্তার দু ধার সিপাহি শান্তিরি গোরার পাহারা, ঘরে ঘরে গোরু কাটে ইত্যাদি। আরো অনেক সংবাদ দিয়াছিলেন, সকল কথা আবার মনেও নাই। কাত্যায়নীর পতিভক্তি অতিরিক্ত ছিল এবং এই পতিভক্তি-সংক্রান্ত নিন্দার কথা তাঁহার কাছে যত শুনিতে পাইব এমন আর কাহারো কাছে নয়। পাড়ার সকল মেয়ের নাড়ীনক্ষত্র পর্যন্ত অবগত ছিলেন। তাঁহার আর-একটি স্বভাব ছিল যে, তিনি ঘন্টায় ঘন্টায় সকলকে মনে করাইয়া দিতেন যে, মিছামিছি পরের চর্চা তাঁর কোনমতে ভালো লাগে না আর বিন্দু, হারার মা ও বোসেদের বাড়ির বড়োবউ যেমন বিশ্বনিন্দুক এমন আর কেহ নয়। কিন্তু তাহাও বলি, কাত্যায়নী ঠাকুরানীকে দেখিতে মন্দ ছিল না--তবে চলিবার, বলিবার চাহিবার ভাবগুলি কেমন এক প্রকারের। তা হউক গে, অমন এক-একজনের স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের অনেকগুলি দোষ জুটিয়াছে সত্য, কিন্তু করুণাকে সে-সকল কথা কে বলে বলো দেখি। সে বেচারি কেমন বিশ্বস্তচিত্তে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার সে স্বপ্ন ভাঙাইবার প্রয়োজন কী। কিন্তু সে অত শত বুঝেও না, অত কথায় কানও দেয় না। কিন্তু রাত দিন শুনিতে শুনিতে দুই-একটা কথা মনে লাগিয়া যায় বৈকি। করুণার অমন প্রফুল্ল মুখ, সেও দুই-একবার মলিন হইয়া যায়--নয় তো কী। কিন্তু নরেন্দ্রকে পাইলেই সে সকল কথা ভুলিয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিতে মনেই থাকে না, অবসরই পায় না। তাহার অন্যান্য এত কথা কহিবার আছে যে, তাহাই ফুরাইয়া উঠিতে পারে না, তো, অন্য কথা! কিন্তু করুণার এ ভাব আর অধিক দিন থাকিবে না তাহা বলিয়া রাখিতেছি। নরেন্দ্র যেরূপ অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। নরেন্দ্র এখন আর কলিকাতায় বড়ো একটা যাতায়াত করে না। করুণাকে ভালোবাসিয়া যে যায় না, সে ভ্রম যেন কাহারো না হয়। কলিকাতায় সে যথেষ্ট ঋণ করিয়াছে, পাওনাদারদের ভয়ে সে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

দিনে দিনে করুণার মুখ মলিন হইয়া আসিতেছে। নরেন্দ্র যখন কলিকাতায় থাকিত, ছিল ভালো। চব্বিশ ঘন্টা চোখের সামনে থাকিলে কাহাকেই বা না চিনা যায়? নরেন্দ্রের স্বভাব করুণার নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। করুণার কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। সর্বদাই খিট্‌খিট্, সর্বদাই বিরক্ত। এক মুহূর্তও ভালা মুখে কথা কহিতে জানে না--অধীরা করুণা যখন হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া তাহার নিকট আসে, তখন সে সহসা এমন বিরক্ত হইয়া উঠে যে করুণার মন একেবারে দমিয়া যায়। নরেন্দ্র সর্বদাই এমন রুষ্ট থাকে যে করুণা তাহাকে সকল কথা বলিতে সাহস করে না, সকল সময় তাহার কাছে যাইতে ভয় করে, পাছে সে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়া উঠে। তদ্ভিন্ন সন্ধ্যাবেলা তাহার নিকট কাহারো ঘেঁষিবার জো ছিল না, সে মাতাল হইয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিত। যাহা হউক, করুণার মুখ দিনে দিনে মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। অলীক কল্পনা বা সামান্য অভিমান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে করুণার চক্ষে প্রায় জল দেখি নাই--এইবার ঐ অভাগিনী আন্তরিক মনের কষ্টে কাঁদিল। ছেলেবেলা হইতেই সে কখনো অনাদর উপেক্ষা সহ্য করে নাই, আজ আদর করিয়া তাহার অভিমানের অশ্রু মুছাইবার আর কেহই নাই। অভিমানের প্রতিদানে তাহাকে এখন বিরক্তি সহ্য করিতে হয়। যাহা হউক, করুণা আর বড়ো একটা খেলা করে না, বেড়ায় না, সেই পাখিটি লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে বসিয়া থাকে। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে কলিকাতায় গেলে দেখিয়াছি এক-একদিন করুণা সমস্ত জ্যোৎস্নারাত্রি বাগানের সেই বাঁধা ঘাটটির উপরে শুইয়া আছে, কত কী ভাবিতেছে জানি না--ক্রমে তাহার নিদ্রাহীন নেত্রের সম্মুখ দিয়া সমস্ত রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র যেমন অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল, তেমনি ঋণও সঞ্চয় করিতে লাগিল। সে নিজে এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারে নাই, টাকার উপর তাহার তেমন মায়াও জন্মে নাই, তবে এক--পরিবারের মুখ চাহিয়া লোকে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে, তা নরেন্দ্রের সে-সকল খেয়ালই আসে নাই। একটু-আধটু করিয়া যথেষ্ট ঋণ সঞ্চিত হইল। অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঘর হইতে দুটা-একটা জিনিস বন্ধক রাখিবার প্রয়োজন হইল।

করুণার শরীর অসুস্থ হইয়াছে। অনর্থক কতকগুলা অনিয়ম করিয়া তাহার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। নরেন্দ্র কহিল সে দিবারাত্র এক পীড়া লইয়া লাগিয়া থাকিতে পারে না ; তাই বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। এ দিকে করুণার তত্ত্বাবধান করে কে তাহার ঠিক নাই ; পণ্ডিতমহাশয় যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেই বা কী হইবে। করুণা কোনো প্রকার ঔষধ খাইতে চায় না, কোনো নিয়ম পালন করে না। করুণার পীড়া বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল ; পণ্ডিতমহাশয় মহা বিব্রত হইয়া নরেন্দ্রকে আসিবার জন্য এক চিঠি লিখিলেন। নরেন্দ্র আসিল, কিন্তু করুণার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া নয়, কলিকাতায় গিয়া তাহার এত ঋণবৃদ্ধি হইয়াছে যে চারি দিক হইতে পাওনাদারেরা তাহার নামে নালিশ আরম্ভ করিয়াছে, গতিক ভালো নয় দেখিয়া নরেন্দ্র সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

নরেন্দ্রের এবার কিছু ভয় হইয়াছে, দেশে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। এবং মদের পাত্রের মধ্যে মনের সমুদয় আশঙ্কা ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। আর কাহারো সঙ্গে দেখা করে নাই, কথা কহে নাই, তাহার সে ঘরটিতে কাহারো প্রবেশ করিবার জো নাই। নরেন্দ্র যেরূপ রুষ্ট ও যেরূপ কথায় কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, চারক-বাকরেরা তাহার কাছে ঘেঁষিতেও সাহস করে না। পীড়িতা করুণা খাদ্যাদি গুছাইয়া ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল ; নরেন্দ্র মহা রুক্ষ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কে তাহাকে সে ঘরে আসিতে কহিল। এ কথার উত্তর আর কী হইতে পারে। তাহার পরে পিশাচ যাহা করিল তাহা কল্পনা করিতেও কষ্ট বোধ হয়--পীড়িতা করুণাকে এমন নিষ্ঠুর পদাঘাত করে যে, সে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িল। নরেন্দ্র সে ঘর হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

অল্প দিনের মধ্যে করুণার এমন আকার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না। তাহার সে শীর্ণ বিবর্ণ বিষণ্ন মুখখানি দেখিলে এমন মায়া হয় যে, কী বলিব ! নরেন্দ্র এবার তাহার উপর যত দূর অত্যাচার করিবার তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরলা সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেছে, একটি কথা কহে নাই, নরেন্দ্রের নিকটে এক মুহূর্তের জন্য রোদনও করে নাই। একদিন কেবল অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া অনেকক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি তোমাকে কী করিয়াছি।"

নরেন্দ্র তাহার উত্তর না দিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

দশম পরিচ্ছেদ

একবার ঋণের আবর্ত-মধ্যে পড়িলে আর রক্ষা নাই। যখনই কেহ নালিশের ভয় দেখাইত, নরেন্দ্র তখনই তাড়াতাড়ি অন্যের নিকট হইতে অপরিমিত সুদে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিত। এইরূপে আসল অপেক্ষা সুদ বাড়িয়া উঠিল। নরেন্দ্র এবার অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। নালিশ দায়ের হইল, সমনও বাহির হইল। একদিন প্রাতঃকালে শুভ মুহূর্তে নরেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ও ধীরে ধীরে শ্রীঘরে বাস করিতে চলিলেন। বেচারি করুণা না খাওয়া, না দাওয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া একাকার করিয়া দিল। কী করিতে হয় কিছুই জানে না, অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় এ কুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কী করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁর করুণা অপেক্ষা অধিক জানিবার কথা নহে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া নিধিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; নিধি জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া ধার শুধিতে পরামর্শ দিল। এখন বিক্রয় করে কে। সে স্বয়ং তাহার ভার লইল। করুণার অলংকারই অল্পই ছিল--পূর্বেই নরেন্দ্র তাহার অধিকাংশ বন্ধক দিয়াছে ও বিক্রয় করিয়াছে, যাহা-কিছু অবশিষ্ট ছিল সমস্ত আনিয়া দিল। নিধি সেই সমুদয় অলংকার ও অন্যান্য গার্হস্থ্য দ্রব্য অধিকাংশ নিজে যৎসামান্য মূল্যে,

কোনো কোনোটা বা বিনা মূল্যেই গ্রহণ করিল ও অবশিষ্ট বিক্রয় করিল। পণ্ডিতমহাশয় তো কাঁদিতে বসিলেন, ভয়ে কষ্টে করুণা অধীর হইয়া উঠিল। বিক্রয় করিয়া যাহা-কিছু পাওয়া গেল তাহাতে পণ্ডিতমহাশয় নিজের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ দিয়া দেয়-অর্থ কোনো প্রকারে পূরণ করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু ঋণ হইতে মুক্ত হইল না। তদ্‌ভিন্ন এই ঘটনায় তাহার কিছুমাত্র শিক্ষাও হইল না। যে রকম করিয়াই হউক-না কেন, এখন মদ নহিলে তাহার আর চলে না। করুণার প্রতি কিছুমাত্র সদয় হয় নাই, করুণা গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি কেন অমন করিয়া বিক্রয় করিল তাহাই লইয়া নরেন্দ্র করুণাকে যথেষ্ট পীড়ন করিয়াছে।

গদাধর ও স্বরূপ এখানে আসিয়াও জুটিয়াছে। সেবারকার প্রহারের পরও গদাধরের অন্তঃপুরসংস্কার-প্রিয়তা কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বুদ্ধি পাইয়াছে। যেখানেই যাউক-না কেন সেখানেই তাহার ঐ চিন্তা, নরেন্দ্রের দেশেও তাঁহার সেই উদ্দেশ্যেই আগমন। ইচ্ছা আছে এখানেও দুই-একটি সৎ উদাহরণ রাখিয়া যাইবেন। পূর্বপরিচিত বন্ধুদের পাইয়া নরেন্দ্র বিলক্ষণ আমোদ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ ও গদাধরের নিকট আরো অনেক ঋণ করিলেন। তাহারা জানিত না যে নরেন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বিশ্বস্তচিত্তে কিঞ্চিৎ সুদের আশা করিয়া ধার দিল।

গদাধরের হস্তে এইবার একটি কাজ পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের মুখে সে কাত্যায়নী ঠাকুরানীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া সে মহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এত বয়সের তারতম্য কোনো হৃদয়সম্পন্ন মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না--বিশেষতঃ সমাজসংস্কারই যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, হৃদয়ের প্রধান আশা, অবকাশের প্রধান ভাবনা, কার্যক্ষেত্রের প্রধান কার্য, তাহারা সমাজের এ-সকল অন্যায় অবিচার কোনো মতেই সহ্য করিতে পারে না। ইহা সংশোধনের জন্য, এ প্রকার অন্যায়রূপে বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য সংস্কারকদিগের সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করা কর্তব্য, এবং আমাদের কাত্যায়নী দেবীর উদ্ধারের জন্য গদাধর সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত আছেন। আর, যখন স্বরূপবাবু তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন, তাহার মধ্যে 'রাহুগ্রাসে চন্দ্র' নামে একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে, যে বিধাতা কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, কোকিলে কুরূপ দিয়াছেন, তাঁহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া একটি বিবাহবর্ণনা লিখিত ছিল ; আমরা গোপনে সন্ধান লইয়া শুনিয়াছিলাম যে, তাহা কাত্যায়নী ঠাকুরানীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয়। অনেক সমালোচক নাকি তাহাতে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিন মেঘ-মেঘ করিয়া আছে, বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, বাদলার আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। আজ করুণা মন্দিরে মহাদেবের পূজা করিতে গিয়াছে। কাঁদিয়া-কাটিয়া প্রার্থনা করিল--যেন তাহাকে আর অধিক দিন এরূপ কষ্টভোগ করিতে না হয় ; এবার তাহার যে সন্তান হইবে সে যেন পুত্র হয়, কন্যা না হয় ; নারীজন্মের যন্ত্রণা যেন আর কেহ ভোগ না করে। করুণা প্রার্থনা করিল--তাহার মরণ হউক, তাহা হইলে নরেন্দ্র স্বেচ্ছামতে অকন্টকে সুখ ভোগ করিতে পাইবে।

এই দুঃখের সময় নরেন্দ্রের এক পুত্র জন্মিল। অর্থের অনটনে সমস্ত খরচপত্র চলিবে কী করিয়া তাহার ঠিক নাই। নরেন্দ্রের পূর্বকার চাল কিছুমাত্র বিগড়ায় নাই। সেই সন্ধ্যাকালে গদাধর ও স্বরূপের সহিত বসিয়া তেমনি মদটি খাওয়া আছে--তেমনি ঘড়িটি, ঘড়ির চেনটি, ফিন্‌ফিনে ধুতিটি, এসেন্সটুকু, আতরটুকু, সমস্তই আছে--কেবল নাই অর্থ। করুণার গার্হস্থ্যপটুতা কিছুমাত্র নাই ; তাহার সকলই উল্টাপাল্টা, গোলমাল। গুছাইয়া কী করিয়া খরচপত্র করিতে হয় তাহার কিছুই জানে না, হিসাবপত্রের কোনো সম্পর্কই নাই, কী করিতে যে কী করে তাহার ঠিক নাই। করুণা যে কী গোলে পড়িয়াছে তাহা সেই জানে। নরেন্দ্র তাহাকে কোনো সাহায্য করে না, কেবল মাঝে মাঝে গালাগালি দেয় মাত্র--নিজে যে কী দরকার, কী অদরকার, কী করিতে হইবে, কী না করিতে হইবে, তাহার কিছুই ভাবিয়া পায় না। করুণা রাত দিন ছেলেটি লইয়া থাকে বটে, কিন্তু কী করিয়া সন্তান পালন করিতে হয়

তাহার কিছু যদি জানে।
ভবি বলিয়া বাড়ির যে পুরাতন দাসী ছিল সে করুণার এই দুর্দশায় বড়ো কষ্ট পাইতেছে। করুণাকে সে নিজহস্তে মানুষ করিয়াছে, এই জন্য তাহাকে সে অত্যন্ত ভালোবাসে। নরেন্দ্রের অন্যায়াচরণ দেখিয়া সে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে খুব মুখনাড়া দিয়া আসিত, হাত মুখ নাড়িয়া যাহা না বলিবার তাহা বলিয়া আসিত। নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইয়া কহিত, "তুই বাড়ি হইতে দূর হইয়া যা !"
সে কহিত, "তোমার মতো পিশাচের হস্তে করুণাকে সমর্পণ করিয়া কোন্ প্রাণে চলিয়া যাই ?"
অবশেষে নরেন্দ্র উঠিয়া দুই-চারিটি পদাঘাত করিলে পরে সে গর্ গর্ করিয়া বকিতে বকিতে কখনো বা কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে চলিয়া যাইত।
ভবিই বাড়ির গিন্নি, সেই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করিত, করুণাকে কোনো কাজ করিতে দিত না। করুণার এই অসময়ে সে যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। ভবির আর কেহ ছিল না। যাহা-কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, সমস্ত করুণার জন্য ব্যয় করিত। করুণা যখন একলা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিত তখন সে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। করুণাও ভবিকে বড়ো ভালোবাসিত ; যখন মনের কষ্টের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিত না, তখন দুই হস্তে ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া এমন কাঁদিয়া উঠিত যে, ভবিও আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না, সে শিশুর মতো কাঁদিয়া একাকার করিয়া দিত। ভবি না থাকিলে করুণা ও নরেন্দ্রের কী হইত বলিতে পারি না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বরূপবাবু কহেন যে, পৃথিবী তাঁহাকে ক্রমাগতই জ্বালাতন করিয়া আসিয়াছে, এই নিমিত্ত মানুষকে তিনি পিশাচ জ্ঞান করেন। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে তিনিই দেশের লোককে জ্বালাতন করিয়া আসিতেছেন। তিনি যাহার সহিত কোনো সংশ্রবে আসিয়াছেন তাহাকেই অবশেষে এমন গোলে ফেলিয়াছেন যে, কী বলিব।
স্বরূপবাবু সর্বদা এমন কবিত্বচিন্তায় মগ্ন থাকেন যে, অনেক ডাকাডাকিতেও তাঁহার উত্তর পাওয়া যায় না ও সহসা 'অ্যাঁ' বলিয়া চমকিয়া উঠেন। হয়তো অনেক সময়ে কোনো পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, অথচ যে সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে মানুষ আছে তাহা টেরও পান নাই, অথবা যাহারা দাঁড়াইয়া আছে তাহারা টের পায় নাই যে তিনি টের পাইতেছেন। ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে হয়তো থাকিয়া বাহিরে চলিয়া যান। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, জানালার ভিতর দিয়া তিনি এক খণ্ড মেঘ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তেমন সুন্দর মেঘ কখনো দেখেন নাই। কখনো কখনো তিনি যেখানে বসিয়া থাকেন, ভুলিয়া দুই-এক খণ্ড তাঁহার কবিতা-লিখা কাগজ ফেলিয়া যান, নিকটস্থ কেহ সে কাগজ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলে তিনি 'ও ! এ কিছুই নহে' বলিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। বোধ হয় তাহার কাছে তাহার আর একখানা নকল থাকে। কিন্তু লোকে বলে যে, না, অনেক বড়ো বড়ো কবির ঐরূপ অভ্যাস আছে। মনের ভুল এমন আর কাহারো দেখি নাই। কাগজপত্র কোথায় যে কী ফেলেন তাহার ঠিক নাই, এইরূপ কাগজপত্র যে কত হারাইয়া ফেলিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে। কিন্তু সুখের বিষয়, ঘড়ি টাকা বা অন্য কোনো বহুমূল্য দ্রব্য কখনো হারান নাই। স্বরূপবাবুর আর-একটি রোগ আছে, তিনি যে-কোনো কবিতা লিখেন তাহার উপরে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে 'বিজন কাননে' বা 'গভীর নিশীথে লিখিত' বলিয়া লিখা থাকে। কিন্তু আমি বেশ জানি যে, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তানগণ-দ্বারা পরিবৃত গৃহে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের স্বরূপবাবু বড়ো প্রেমিক ব্যক্তি। তিনি যত শীঘ্র প্রেমে বাঁধা পড়েন এত আর কেহ নয় ; ইহাতে তিনিও কষ্ট পান আর অনেককেই কষ্ট দেন।
স্বরূপবাবু দিবারাত্রি নরেন্দ্রের বাড়িতে আছেন। মাঝে মাঝে আড়ালে-আবডালে করুণাকে দেখিতে পান, কিন্তু তাহাতে বড়ো গোলযোগ বাধিয়াছে। তাঁহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে ও রাত্রে ঘুম হইতেছে না। তিনি ঘোর উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়াছেন--সুতরাং

এখন তাঁহাকে কোকিলেও ঠোকরায় না, চন্দ্রকিরণও দগ্ধ করে না বটে, কিন্তু হইলে হয় কী--পৃথিবী তাঁহার চক্ষে অরণ্য, শ্মশান হইয়া গিয়াছে। ফুল শুকাইতেছে আবার ফুটিতেছে, সূর্য অস্ত যাইতেছে আবার উঠিতেছে, দিবস আসিতেছে ও যাইতেছে, মানুষ শুইতেছে ও খাইতেছে, সকলই যেমন ছিল তেমনি আছে, কিন্তু হায় ! তাঁহার হৃদয়ে আর শান্তি নাই, দেহে বল নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, হৃদয়ে সুখ নাই--এক কথায়, যাহাতে যাহা ছিল তাহাতে আর তাহা নাই ! স্বরূপ কতকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিল, তাহাতে যাহা লিখিবার সমস্তই লিখিল। তাহাতে ইঙ্গিতে করুণার নাম পর্যন্ত গাঁথিয়া দিল। এবং সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া মধ্যস্থ-নামক কাগজে পাঠাইয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নিধি নরেন্দ্রের বাড়িতে মাঝে মাঝে আইসে। কিন্তু আমরা যে ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া আসিতেছি সে সূত্রের মধ্যে কখনো পড়ে নাই, এইবার পড়িয়াছে। স্বরূপবাবু তাঁহার অভ্যাসানুসারে ইচ্ছাপূর্বক বা দৈবক্রমেই হউক, এক খণ্ড কাগজ ঘরে ফেলিয়া গিয়াছেন, নিধি সে কাগজটি কুড়াইয়া পাইয়াছে। সে কাগজটিতে গুটিকয়েক কবিতা লিখা আছে। অন্য লোক হইলে সে কবিতাগুলির সরল অর্থটি বুঝিয়া পড়িত ও নিশ্চিন্ত থাকিত, কিন্তু বুদ্ধিমান নিধি সেরূপ লোকই নহে। যদি বা তাহার কোনো গূঢ় অর্থ না থাকিত তথাপি নিধি তাহা বাহির করিতে পারিত। তবু ইহাতে তো কিছু ছিল। নিধির কবিতাগুলি বড়ো ভালো ঠেকিল না। ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল ও ভাবিল ইহার নিগূঢ় তাহাকে জানিতে হইবে। অমন বুদ্ধিমান লোকের কাছে কিছুই ঢাকা থাকে না, ইঙ্গিতে সকলই বুঝিয়া লইল। চতুরতাভিমানী লোকেরা নিজবুদ্ধির উপর অসন্দিগ্ধরূপে নির্ভর করিয়া এক-এক সময়ে সর্বনাশ ঘটায়, এমন আর কেহই নহে।

'দিদি, কেমন আছ দেখিতে আসিয়াছি' বলিয়া নিধি করুণার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। নিধি ছেলেবেলা হইতেই অনুপের অন্তঃপুরে যাইত ও করুণার মাকে মা বলিয়া ডাকিত। নিধি এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই করুণা কেমন আছে দেখিতে আইসে। একদিন নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছে। নরেন্দ্র কবে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবে, করুণা স্বরূপবাবুর নিকট ভবিকে জানিয়া আসিতে কহিল। নিধি আড়াল হইতে শুনিতে পাইল, মনে মনে কহিল 'হুঁ হুঁ- বঝিয়াছি, এত লোক থাকিতে স্বরূপবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠানো কেন ! গদাধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেও তো চলিত।'

একদিন করুণা ভবিকে কী কথা বলিতেছিল, দূর হইতে নিধি শুনিতে পাইল না, কিন্তু মনে হইল করুণা যেন একবার 'স্বরূপবাবু' বলিয়াছিল-- আর-একটি প্রমাণ জুটিল। আর একদিন নরেন্দ্র স্বরূপ ও গদাধর বাগানে বসিয়াছিল, করুণা সহসা জানালা দিয়া সেই দিক পানে চাহিয়া গেল, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে করুণা স্বরূপেরই দিকে চাহিয়াছিল। নিধি এই তো তিনটি অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছে, ইহা অন্য লোকের নিকট যাহাই হউক কিন্তু নিধির নিকট ইহা সমস্তই পরিষ্কার প্রমাণ। শুদ্ধ ইহাই যথেষ্ট নহে, করুণা যে দিনে দিনে শীর্ণ বিষণ্ন রুগ্‌ণ হইয়া যাইতেছে, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার কারণ আর কিছুই নয়-- স্বরূপের ভাবনা।

এখন স্বরূপের নিকট কথা আদায় করিতে হইবে, এই ভাবিয়া নিধি ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হল। হঠাৎ গিয়া কহিল, "করুণা তো, ভাই, তোমার জন্য একেবারে পাগল।"

স্বরূপ একেবারে চমকিয়া উঠিল। আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী করিয়া জানিলে।" নিধি মনে মনে কহিল, হুঁ-হুঁ, আমি তোমাদের ভিতরকার কথা কী করিয়া সন্ধান পাইলাম ভাবিয়া ভয় পাইতেছ ? পাইবে বৈকি, কিন্তু নিধিরামের কাছে কিছুই এড়াইতে পায় না।' কহিল, "জানিলাম, এক রকম করিয়া।"

বলিয়া চোখ টিপিতে টিপিতে চলিয়া গেল। তাহার পরদিন গিয়া আবার স্বরূপকে কহিল, "করুণার সহিত তমি যে গোপনে গোপনে সাক্ষাৎ করিতেছ ইহা নরেন্দ্র যেন টের না পায়।"

স্বরূপ কহিল, "সেকি ! করুণার সহিত একবারও তো আমার দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হয় নাই।"

নিধি মনে-মনে কহিল, 'নিশ্চয় দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল, নহিলে এত করিয়া ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে কেন।' ইহাও একটি প্রমাণ হইল, কিন্তু আবার স্বরূপ যদি বলিত যে 'হাঁ দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল' তবে তাহাও একটি প্রমাণ হইত।

যাহা হউক, নিধির মনে আর সন্দেহ রহিল না। এমন একটি নিগূঢ় বার্তা নিধি আপনার বুদ্ধিকৌশলে জানিতে পারিয়াছে, এ কথা কি সে আর গোপনে রাখে। তাহার বুদ্ধির পরিচয় লোকে না পাইলে আর হইল কী। 'তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহা নয়, আমি ভিতরকার কথা সকল জানি'-- চতুরাভিমানী লোকেরা ইহা বুঝাইতে পারিলে বড়োই সন্তুষ্ট হয়। নিধির কাছে যদি বল যে, 'রাবহরিবাবু বড়ো সৎলোক' অমনি নিধি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'কী বলিতেছ। কে সৎলোক। রামহরি বাবু ? ও'-- এমন করিয়া বলিবে যে তুমি মনে করিবে, এ বুঝি রাবহরিবাবুর ভিতরকার কী একটা দোষ জানে। পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে, 'সে অনেক কথা।' নিধি সম্প্রতি যে গুপ্ত খবর পাইয়াছে তাহা পরামর্শ দিবার ছলে নরেন্দ্রকে বলিবে, এইরূপ মনে-মনে স্থির করিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কয় দিন ধরিয়া ছোটো ছেলেটির পীড়া হইয়াছে। তাহা হইবে না তো কী। কিছুরই তো নিয়ম নাই। করুণা ডাক্তার ডাকাইয়া আনিল, ডাক্তার আসিয়া কহিল পীড়া শক্ত হইয়াছে। করুণা তো দিন রাত্রি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। পীড়া মাড়িতে লাগিল, করুণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল।গ্রামের নেটিব ডাক্তার কপালীচরণবাবু পীড়ার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাঁহাকে ফি দিবার সময় তনি কহিলেন, 'থাক্, থাক্, পীড়া আগে সারুক।' পণ্ডিতমহাশয় বুঝিলেন, নরেন্দ্রদের দুরবস্থা শুনিয়া দয়ার্দ্র ডাক্তারটি বুঝি ফি লইতে রাজি নহেন। দুই বেলা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, তিনিও অম্লানবদনে আসিলেন।

নরেন্দ্র এক্ষণে বাড়ি নাই। ও পাড়ার পিতৃমাতৃহীন নাবালক জমিদারটি সম্প্রতি সাবালক হইয়া উঠিয়া জমিদারি হাতে লইয়াছেন, নরেন্দ্র তাঁহাকেই পাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারই স্কন্ধে চাপিয়া নরেন্দ্র দিব্য আরামে আমোদ করিতেছেন এবং গদাধর ও স্বরূপকে তাঁহারই হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গদাধর ও স্বরূপকে যে শীঘ্র তাঁহার স্কন্ধ হইতে নড়াইবেন, তাহার জো নাই-- গদাধরের একটি উদ্দেশ্য আছে, স্বরূপেরও এক উদ্দেশ্য আছে।

ছেলেটির পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার ডাকিতে একজন লোক পাঠানো হইল। ডাক্তারটি তাহার হস্ত দিয়া, তাঁহার দু বেলার যাতায়াতের দরুণ যাহা পাওনা আছে সমস্ত হিসাব সমেত এক বিল পাঠাইয়া দিলেন। ছেলেটি অবশ হইয়া পড়িয়াছে, করুণা তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সকল কর্মে নিপুণ নিধি মাঝে মাঝে তাহার নাড়ি দেখিতেছে, কহিল নাড়ি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আকুলহৃদয়ে সকলেই ডাক্তারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় বিল লইয়া সেই লোকটি ফিরিয়া আসিল। সকলেই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তার কই ?' সে সেই বিল হাজির করিল। সকলেই তো অবাক। মুখ চোখ শুকাইয়া পণ্ডিমহাশয় তো ঘামিতে লাগিলেন ; নিধির হাত ধরিয়া কহিলেন, "এখন উপায় কী।"

নিধি কহিল, "টাকার জোগাড় করা হঠক।"

সহসা টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে। এ দিকে পীড়ার অবস্থা ভালো নহে, যত কালবিলম্ব হয় ততই খারাপ হইবে। মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল, করুণা বেচারি কাঁদিতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় বিব্রত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, হাতে যাহাকিছু ছিল আনিলেন। কাত্যায়নী ঠাকুরানীটি টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া তবে টাকা বাহির করেন। ভবি তাহার শেষ সম্বল বাহির করিয়া দিল।

অনেক কষ্টে অবশেষে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। ডাক্তারটি অম্লানবদনে কহিলেন, "ছেলে বাঁচিবে না।"

এমন সময় টলিতে টলিতে নরেন্দ্র ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘরে ঢুকিয়া ঘরে যে কিসের গোলমাল কিছুই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ শূন্যনেত্রে পণ্ডিতমহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, অবশেষে কী বিড় বিড় করিয়া বকিয়া পণ্ডিতমাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিল-- পণ্ডিতমহাশয়ও মহা গোলযোগে পড়িয়া গেলেন। ডাক্তার ছাড়াইতে গেলেন, তাঁহার হাতে এমন একটি কামড় দিল যে রক্ত পড়িতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল।

ক্রমে শিশুর মুখ নীল হইয়া আসিল। করুণা সমস্ত গোলমালে অর্ধ-হতজ্ঞান হইয়া বালিশে ঠেস দিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে শিশুর মৃত্যু হইল, কিন্তু দুর্বল করুণা তখন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আহা, বিষণ্ন করুণাকে দেখিলে এমন কষ্ট হয় যে, ইচ্ছা করে প্রাণ দিয়াও তাহার মনের যন্ত্রণা দূর করি। কতদিন তাহাকে আর হাসিতে দেখি নাই। ভালো করিয়া আহার করে না, স্নান করে না, ঘুমায় না ; মলিন, বিবর্ণ, ম্রিয়মান, শীর্ণ ; জ্যোতিহীন চক্ষু বসিয়া গিয়াছে ; মুখশ্রী এমন দীন করুণ হইয়া গিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় না যে এ বালিকা কখনো হাসিতে জানিত। ভবির হস্তে যাহা-কিছু অর্থ ছিল সমস্ত প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, কী করিয়া সংসার চলিবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। পণ্ডিতমহাশয়ের সাহায্যে কোনো মতে দিন চলিতেছে।

নিধি স্বরূপের উল্লেখ করিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে বাবুটি কী করে বলিতে পারো।"

নরেন্দ্র। কেন বলো দেখি।

নিধি। ও লোকটিকে আমার তো বড়ো ভালো ঠেকে না।

নরেন্দ্র। কেন, কী হইয়াছে।

নিধি। না, কছিুই হয় নাই, তবে কিনা-- সে কথা থাক্-- বাবুটির বাড়ি কোথায়।

নরেন্দ্র। কলিকাতা।

নিধি। আমিও তাহাই ঠাওরাইয়াছিলাম, নহিলে এমন স্বভাব হইবে কেন।

নরেন্দ্র। কেন, কী হইয়াছে, বলোই না।

নিধি। আমি সে কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু উহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দেও।

নরেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়া কহিল, "কী কথা বলিতেই হইবে।"

নিধি কহিল, "যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর চারা নাই, কিন্তু সাবধান থাকিয়ো, ও লোকটি আর যেন বাড়ির ভিতরের দিকে না যায়।"

নরেন্দ্র। সেকি কথা, স্বরূপ তো বাড়ির ভিতরে যায় নাই।

নিধি। সে কি তোমাকে বলিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র অবাক হইয়া নিধির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিধি কহিল, "আমি তো ভাই, আমার কাজ করিলাম, এখন তোমার যাহা কর্তব্য হয় করো।"

নরেন্দ্র ভাবিল, এ-সকল তো বড়ো ভালো লক্ষণ নয়।

স্বরূপ কয়দিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, করুণা তাহার জন্য একেবারে পাগল এ কথা নিধি সহসা তাহাকে কেন কহিল ; বুঝিল, নিশ্চয় করুণা তাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে। স্বরূপ ভাবিল, 'তবে আমিও তাহার প্রেমে পাগল এ কথাও তো তাহাকে জানানো উচিত।' স্থির করিল, সুবিধা পাইলে নিজে গিয়া জানাইবে।

জোৎস্না রাত্রি। ছেলেবেলা করুণা যেখানে দিন-রাত্রি খেলা করিয়া বেড়াইত সেই বাগানের ঘাটের উপর সে শুইয়া আছে, অতি ধীরে ধীরে বাতাসটি গায়ে লাগিতেছে। সেই জ্যোৎস্নারাত্রির সঙ্গে, সেই মৃদু বাতাসটির সঙ্গে, সেই নারিকেলব নটির সঙ্গে তাহার ছেলেবেলাকার কথা এমন জড়িত ছিল, যেন তাহারা তার ছেলেবেলাকারই একটি অংশ। সেই দিনকার কথাগুলি, শ্মশানে বায়ু-উচ্ছ্বাসের ন্যায় করুণার প্রাণের ভিতর গিয়া হু হু করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় করুণার বুক ফাটিয়া, বুকের বাঁধন যেন

ছিড়িয়া অশ্রুর স্রোত উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল।
বাগানে আর দুইজন লোক লুকাইয়া আছে, নরেন্দ্র ও স্বরূপ। নরেন্দ্র চুপিচুপি স্বরূপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে, দেখিবে স্বরূপ কী করে।
করুণা সহসা দেখিল একজন লোক আসিতেছে। চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেও।"
স্বরূপ কহিল, "আমি স্বরূপচন্দ্র। নিধিকে দিয়া যে কথা বলিয়া পাঠানো হইয়াছিল তাহা কি স্মরণ নাই!"
করুণা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে নরেন্দ্র আর না থাকিতে পারিয়া বাহির হইয়া পড়িল। করুণা তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র ভাবিল তাহাকে দেখিতে পাইয়াই করুণা ভয়ে পলাইয়া গেল বুঝি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র কহিল, "হতভাগিনি, বাহির হইয়া যা!"
করুণা কিছুই কহিল না।
"এখনই দূর হইয়া যা।"
করুণা নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইল, অগ্রসর হইয়া কঠোর ভাবে করুণার হস্ত ধরিল। করুণা কহিল, "কোথায় যাইব।"
নরেন্দ্র করুণার কেশগুচ্ছ ধরিয়া নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতে লাগিল ; কহিল, "এখনই দূর হইয়া যা।"
ভবি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "কোথায় দূর হইয়া যাইবে।"
এবং স্মরণ করাইয়া দিল যে, ইহা তাহার পিতার বাটী নহে।
নরেন্দ্র তাহাকে উচ্চতম স্বরে কহিল, "তুই কী করিতে আইলি।"
ভবি মাঝে পড়িয়া করুণাকে ছাড়াইয়া লইল ও কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে কেমন তুমি করুণাকে অনুপের বাটী হইতে বাহির করিতে পারো দেখি!"
নরেন্দ্র ভবিকে যতদূর প্রহার করিবার করিল ও অবশেষে শাসাইয়া গেল যে, "পুলিসে খবর পাঠাইয়া দিই গে।"
ভবি কহিল, "ইহা তো আর মগের মুলুক নহে।"
নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর করুণা ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ভবি, আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দে, আমি চলিয়া যাই।"
ভবি করুণাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিল, "সেকি মা, কোথায় যাইবে। আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন আর তোমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতে হইবে না।"
বলিতে বলিতে ভবি কাঁদিয়া ফেলিল। করুণা আর একটি কথা বলিতে পারিল না, তাহার বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিন করুণা কিছু খাইল না, ভবি আসিয়া কত সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু কোনোমতে তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না।
সমস্ত দিন তো কোনো প্রকারে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইল, পল্লীর কুটীরে কুটীরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে, পূজার বাড়িতে শঙ্খ ঘন্টা বাজিতেছে। সমস্ত দিন করুণা তাহার সেই শয্যাতেই পড়িয়া আছে, রাত্রি হইলে পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্তঃপুরে সেই বাগানটিতে চলিয়া গেল। সেখানে কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিল, রাত্রি আরো গভীরতর হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীকে ঘুম পাড়াইয়া নিশীথের বায়ু অতি ধীর পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে ; এমন শান্ত ঘুমন্ত গ্রাম যে মনে হয় না, এ গ্রামে এমন কেহ আছে এমন রাত্রে মর্মভেদী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মরণকে আহ্বান করিতেছে!
করুণার বিজন ভাবনায় সহসা ব্যাঘাত পড়িল। করুণা সহসা দেখিল নরেন্দ্র আসিতেছে। বেচারি ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিল। নরেন্দ্র আসিয়া অতি কর্কশ স্বরে কহিল, "আমি উহাকে প্রতি ঘরে

খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, উনি কিনা বাগানে আসিয়া বসিয়া আছেন ! আগ রাত্রে যে বড়ো বাগানে আসিয়া বসা হইয়াছে ? স্বরূপ তো এখানে নাই।"

করুণা মনে করিল এইবার উত্তর দিবে, নিরপরাধিনীর উপর কেন নরেন্দ্রের এইরূপ সংশয় হইল-- জিজ্ঞাসা করিবে-- কিন্তু কী কথা বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। নরেন্দ্রের ভাব দেখিয়া সে ভয়ে আকুল হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না।

নরেন্দ্র কহিল, "আয়, বাড়িতে আর এক মুহূর্ত থাকিতে পাইবি না।"

করুণা একটি কথাও কহিল না, কিসের অলক্ষিত আকর্ষণে যেন সে অগ্রসর হইতে লাগিল। একবার সে মনে করিল বলিবে 'ভবির সহিত দেখা করিয়াই যাই', কিন্তু একটি কথাও বলিতে পারিল না। গৃহের দ্বার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিল, ব্যাকুল হৃদয়ে দেখিল সম্মুখে দিগন্তপ্রসারিত মাঠে জনপ্রাণী নাই। মনে করিল-- সে নরেন্দ্রের পায়ে ধরিয়া বলিবে তাহার বড়ো ভয় হইতেছে, সে যাইতে পারিবে না, সে পথ ঘাট কিছুই চিনে না। কিন্তু মুখে কথা সরিল না। ধীরে ধীরে দ্বারের বাহিরে গেল। নরেন্দ্র কহিল, "কালি সকালে তোকে যদি গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাই তবে পুলিশের লোক ডাকাইয়া বাহির করিয়া দিব।"

দ্বার রুদ্ধ হইল, ভিতর হইতে নরেন্দ্র তালা বন্ধ করিল। করুণার মাথা ঘুরিতে লাগিল, করুণা আর দাঁড়াইতে পারিল না, অবসন্ন হইয়া প্রাচীরের উপর পড়িয়া গেল।

কত ক্ষণের পর উঠিল। মনে করিল, ভবির সহিত একবার দেখা হইল না ? কতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য নয়নে বাড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাচীরের বাহির হইয়া দেখিল-- তাহার সেই বাগানের গাছপালা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল-- দ্বিতীয় তলের যে গৃহে তাহার পিতা থাকিতেন, যে গৃহে সে তাহার পিতার সহিত কতদিন খেলা করিয়াছে, সে গৃহের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, ভিতরে একটি ভগ্ন খাট পড়িয়া আছে, তাহার সম্মুখে নিস্তেজ একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কত ক্ষণের পর নিশ্বাস ফেলিয়া করুণা ফিরিয়া দাড়াইল। গ্রামের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কতক দূর গিয়া আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই বিজন কক্ষে একটিমাত্র মুমূর্ষু প্রদীপ জ্বলিতেছে। ছেলেবেলা যাহারা করুণাকে সুখে খেলা করিতে দেখিয়াছে তাহারা সকলেই আপন কুটীরে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাদের সেই কুটীরের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে করুণা চলিয়া গেল। আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল তাহার পিতার কক্ষে এখনো সেই প্রদীপটি জ্বলিতেছে।

সেই গভীর নীরব অসংখ্য তারকা নিমেষহীন স্থির নেত্রে নিম্নে চাহিয়া দেখিল-- দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য মাঠের মধ্য দিয়া একটি রমণী একাকিনী চলিয়া যাইতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিমহাশয় সকালে উঠিয়া দেখিলেন কাত্যায়নী ঠাকুরানী গৃহে নাই। ভাবিলেন গৃহিণী বুঝি পাড়ার কোনো মেয়েমহলে গল্প ফাঁদিতে গিয়াছেন। অনেক বেলা হইল, তথাপি তাহার দেখা নাই। তা, মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি এরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় আর বেশিক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না, যেখানে যেখানে ঠাকুরানীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল খোঁজ লইতে গেলেন। মেয়েরা চোখ-টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল ; কহিল, 'মিন্‌সা এক দণ্ড আর কাত্যায়নী-পিসিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না ! কোথায় গিয়াছে বুঝি, তাই খুঁজিতে বাহির হইয়াচেন। কিন্তু পুরুষ মানুষের অতটা ভালো দেখায় না।' তাহার মানে, তাঁহাদের স্বামীরা অতটা করেন না, কিন্তু যদি করিতেন তবে বড়ো সুখের হইত। যেখানে কাত্যায়নীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল সেখানেও খুঁজিতে গেলেন-- সেখানেও পাইলেন না। এই তো পণ্ডিতমহাশয় ব্যাকুল হইয়া মুহুর্মুহু নস্য লইতে লাগিলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে নিধিদের বাড়ি গিয়া পড়িলেন।

নিধি জিজ্ঞাসা করিল, ঘোষেদের বাড়ি দেখিয়াছেন ? মিত্রদের বাড়ি দেখিয়াছেন ? দত্তদের বাড়ি খোঁজ লইয়াছেন ? এইরূপে মুখুজ্জে চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে ইত্যাদি যত বাড়ি জানিত প্রায় সকলগুলিরই

উল্লেখ করিল, কিন্তু সকল-তাতেই অমঙ্গল উত্তর পাইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য ভাবিতে লাগিল। অবশেষে নিধি নিজে নরেন্দ্রের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। শূন্য গৃহ যেন হাঁ হাঁ করিতেছে। বিষণ্ন বাড়ির চারি দিক যেন কেমন অন্ধকার হইয়া আছে, একটা কথা কহিলে দশটা প্রতিধ্বনি যেন ধমক দিয়া উঠিতেছে। একটা চাকর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে সোপানের উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, নিধি তাহাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গদাধরবাবু কোথায়।"

সে কহিল, "কাল রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আজও আসেন নাই-- বোধ হয় কলিকাতায় গিয়া থাকিবেন।"

নিধি ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিমহাশয়কে কহিল, "যদি খুঁজিতে হয় তো কলিকাতায় গিয়া খোঁজো গে।"

পণ্ডিমহাশয় তো এ কথার ভাবই বুঝিতে পারিলেন না। নিধি কহিল, "গদাধর নামে একটি বাবু আসিয়াছেন, দেখিয়াছ ?"

পণ্ডিমহাশয় শূন্যগর্ভ একটি হাঁ দিয়া গেলেন। নিধি কহিল, "সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে কাত্যায়নীপিসি কলিকাতা ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন।"

পণ্ডিমহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু তিনি এ কথা কোনোক্রমেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তিনি কহিলেন, তিনি নন্দীদের বাড়ি ভালো করিয়া দেখেন নাই, সেখানেই নিশ্চয় আচেন। এই বলিয়া নন্দী আদি করিয়া আর-একবার সমস্ত বাড়ি অন্বেষণ করিয়া আসিলেন, কোথাও সন্ধান পাইলেন না। ম্লানবদনে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

নিধি কহিল, "আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, এরূপ ঘটিবে।"

কিন্তু তিনি পূর্বে কোনোদিন এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নাই।

সিন্দুক খুলিতে গিয়া পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন, কাত্যায়নী ঠাকুরানী শুদ্ধ যে নিজে গিয়াছেন এমন নহে, যত-কিছু গহনাপত্র টাকাকড়ি ছিল তাহার সমস্ত লইয়া গিয়াছেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া পণ্ডিতমহাশয় সমস্ত দিন কাঁদিলেন।

নিধি কহিল, "এ সমস্তই নরেন্দ্রের ষড়যন্ত্রে ঘটিয়াছে, তাহার নামে নালিশ করা হউক, আমি সাক্ষী তৈয়ার করিয়া দিব।"

নিধি এরূপ একটা কাজ হাতে পাইলেই বাঁচিয়া যায়। পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, যাহা ভাগ্যে ছিল হইয়াছে, তাই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রের নামে নালিশ করিতে পারেন না।

নিধিকে লইয়া পণ্ডিতমহাশয় কলিকাতায় আসিলেন। একদিন দুই প্রহরের রৌদ্রে পণ্ডিমহাশয়ের শান্ত স্থূল দেহ কালীঘাটের ভিড়ের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে একটি সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিমহাশয়ের মন্দির দেখা হইয়াছে, কালীঘাট হইতে চলিয়া যাইবেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। গাড়ি দেখিয়া তাহা অধিকার করিবার আশায় কোনো প্রকারে ভিড় ঠেলিয়া-ঠুলিয়া সেই দিকে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন গাডি হইতে প্রথমে একটি বাবু ও তাঁহার পরে একটি রমণী হাসিতে হাসিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, গাড়ি হইতে নামিলেন ও হেলিতে-দুলিতে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। পণ্ডিমহাশয় সে রমণীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সে রমণীটি তাঁহারই কাত্যায়নী ঠাকুরানী !

তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন-- কাত্যায়নী তাঁহার উচ্চতম স্বরে কহিলেন, "কে রে মিন্‌সে। গায়ের উপর আসিয়া পড়িস যে ! মরণ আর-কি !" এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা গালাগালি বর্ষণ করিয়া অবশেষে পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার 'চোখের মাতা' খাইয়াছেন কি না ও বুড়া বয়সে এরূপ অসদাচরণ করিতে লজ্জা করেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিমহাশয় দুইটি প্রশ্নের কোনোটির উত্তর না দিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে াগিল, মনে হইল যেন এখনি মূর্ছিত হইয়া পড়িবেন। কাত্যায়নীর সঙ্গে যে বাবু ছিলেন তিনি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার স্টীকের বাড়ি পণ্ডিতমহাশয়কে দুই একটা গোঁজা মারিয়া ও বিজাতীয় ভাষায় যথেষ্ট মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া,

ইংরাজি অর্ধস্ফুট স্বরে 'পাহারাওয়ালা পাহারাওয়ালা' করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। পাহাড়াওয়ালা আসিল ও পণ্ডিতমহাশয়কে ঘিরিয়া দশ সহস্র লোক জমা হইল। বাবু কহিলেন, এই লোকটি তাঁহার পকেট হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছে।

পণ্ডিতমহাশয় ভয়ে আকুল হইলেন ও কাঁদো-কাঁদো স্বরে কহিলেন, "না বাবা, আমি লই নাই। তবে তোমার ভ্রম হইয়া থাকিবে, আর কেহ লইয়া থাকিবে।"

'চোর চোর' বলিয়া একটা ভারি কলরব উঠিল, চারি দিকে কতকগুলা ছোঁড়া জমিল, কেহ তাঁহার টিকি ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ তাঁহাকে চিমটি কাটিতে লাগিল-- পণ্ডিতমহাশয় থতমত খাইয়া কাঁদয়া ফেলিলেন। তাঁহার ট্যাঁকে যত টাকা ছিল সমস্ত লইয়া বাবুটিকে কহিলেন, "বাবা, তোমার টাকা হারাইয়া থাকে যদি, তবে এই লও। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমার পায়ে পড়িতেছি-- আমাকে রক্ষা করো।"

ইহাতে তাঁহার দোষ অধিকতর সপ্রমাণ হইল, পাহারাওয়ালা তাঁহার হাত ধরিল।

এমন সময়ে নিধি চোখ মুখ রাঙাইয়া ভিড় ঠেলিয়া াসিয়া উপস্থিত হইল। নিধির এক-সুট চাপকান পেন্টুলুন ছিল, কলিকাতায় সে চাপকান-পেন্টুলুন ব্যতীত ঘর হইতে বাহির হইত না। চাপকান-পেন্টুলুন-পরা নিধি আসিয়া যখন গম্ভীর স্বরে কহিল 'কোন্ হ্যায় রে!' তখন অমনি চারি দিক স্তব্ধ হইয়া গেল। নিধি পকেট হইত এক টুকরো কাগজ ও পেন্‌সিল বাহির করিয়া পাহাড়াওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল তাহার নম্বর কত ও সে কোন্ থানায় থাকে, এবং উত্তর না পাইতে পাইতে সম্মুখস্থ ছ্যাকরা গাড়ির কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল, "লালদিঘির এণ্ড্রু-সাহেবের বাড়ি জানো?"

পাহারাওয়ালা ভাবিল না জানি এণ্ড্রুসাহেব কে হইবে ও দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে 'বাবু বাবু' করিতে লাগিল। নিধি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনার বাড়ি কোথায়। নাম কী।"

বাবুটি গোলমালে সট্ করিয়া সরিয়া পড়িলেন এবং সে পাহারাওয়ালাটিও অধিক উচ্চবাচ্য না করিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িল।

ভিড় চুকিয়া গেল, নিধি ধরাধরি করিয়া পণ্ডিমহাশয়কে একটি গাড়িতে লইয়া গিয়া তুলিল এবং সে রাত্রেই দেশে যাত্রা করিল। বেচারি পণ্ডিমহাশয় লজ্জায় দুঃখে কষ্টে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। নিধি কহিল, কাত্যায়নীর নামে গহনা ও টাকা-চুরির নালিশ করা যাক। পণ্ডিমহাশয় কোনোমতে সম্মত হইলেন না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতমহাশয় করুণার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন। তিনি কহিলেন, "এ গ্রামে থাকিয়া আর কী করিব। শূন্য গৃহ ত্যাগ করে কাশী চলিলাম। বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রাণ বিসর্জন করিব।" এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় ঘর দুয়ার সমস্ত বিক্রয় করিয়া কাশী চলিলেন। পাড়ার সমস্ত বালকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, অশ্রুপূর্ণনয়নে তিনি সকলকে আদর করিলেন। এমন একটি বালক ছিল না যে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে নাই।

এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতমহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক লোক দেখিয়াছি কিন্তু তেমন ভালোমানুষ আর দেকিলাম না।

নরেন্দ্রের বাড়িঘর সমস্ত নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় আছে কে জানে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে রজনী মনে করিল, 'আমিই বুঝি মহেন্দ্রের চলিয়া যাইবার কারণ!'

মহেন্দ্রের মাতা মনে করিলেন যে, রজনী বুঝি মহেন্দ্রের উপর কোনো কর্কশ ব্যবহার করিয়াছে; আসিয়া কহিলেন, "পোড়ারমুখী ভালো এক ডাকিনীকে ঘরে আনিয়াছিলাম!"

রজনীর শ্বশুর আসিয়া কহিলেন, " রাক্ষসী, তুই এই সংসার ছারখার করিয়া দিলি!"

রজনীর ননদ আসিয়া কহিলেন, ''হতভাগিনীর সহিত দাদার কী কুক্ষণেই বিবাহ হইয়াছিল !''
রজনী একটি কথাও বলিল না। রজনীর নিজেরই যে আপনার প্রতি দারুণ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, সেই ঘৃণার যন্ত্রণায় সে মনে করিল-- বুঝি ইহার একটি কথাও অন্যায় নহে। সে মনে করিল, যে তিরস্কার তাহাকে করা হইতেছে সে তিরস্কার বুঝি তাহার যথার্থই পাওয়া উচিত। রজনী কাহাকেও কিছু বলিল না, একবার কাঁদিলও না। এ কয়দিন তাহার মুখশ্রী অতিশয় গম্ভীর-- অতিশয় শান্ত-- যেন মনে-মনে কী একটি সংকল্প করিয়াছে, মনে-মনে কী একটি প্রতিজ্ঞা বাঁধিয়াছে।
এই দুই মাস হইল মহেন্দ্র বিদেশে গিয়াছে-- এই দুই মাস ধরিয়া রজনী যেন কী একটা ভাবিতেছিল, এত দিনে সে ভাবনা যেন শেষ হইল, তাই রজনীর মুখ অতি গম্ভীর অতি শান্ত দেখাইতেছে।
সন্ধ্যা হইলে ধীরে ধীরে সে মোহিনীর বাড়িতে গেল। মোহিনীর সহিত দেখা হইল, থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। যেন কী কথা বলিতে গিয়াছিল, বলিতে পারিল না, বলিতে সাহস করিল না। মোহিনী অতি স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, ''কী রজনী। কি বলিতে আসিয়াছিস।''
রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কহিল, ''দিদি, আমার একটি কথা রাখতে হবে।''
মোহিনী আগ্রহের সঙ্গে কহিল, ''কী কথা বলো।''
রজনী কতবার 'না বলি' 'না বলি' করিয়া অনেক পীড়াপীড়ির পর আস্তে আস্তে কহিল মোহিনীকে একটি চিঠি লিখিতে হইবে। কাহাকে লিখিতে হইবে। মহেন্দ্রকে। কী লিখিতে হইবে। না, তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আসুন, তাঁহাকে আর অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হবে না। রজনী তাহার দিদির বাড়িতে থাকিবে। বলিতে বলিতে রজনী কাঁদিয়া ফেলিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। রাশি রাশি ধূলি উড়াইয়া গ্রামের পথ দিয়া মাঝে মাঝে দুই-একটা গোরুর গাড়ি মন্থর গমনে যাইতেছে। দুই-একজন মাত্র পথিক নিভৃত পথে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবল একটি গ্রাম্য বাঁশির স্বর শুনা যাতেছে, বোধ হয় কোনো রাখাল মাঠে গোরু ছাড়িয়া দিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া বাজাইতেছে।
করুণা সমস্ত রাত চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত হইয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে। করুণা-যে কোনো কুটীরে আতিথ্য লইবে, কাহারো কাছে কোনো প্রার্থনা করিবে, সে স্বভাবেরই নয়। কী করিলে কি হইবে, কী বলিতে হয়, কী করিতে হয়, তাহার কিছু যদি ভাবিয়া পায়। লোক দেখিলে সে ভয়ে আকুল হইয়া পড়ে। এক-একজন করিয়া পথিক চলিয়া যাইতেছে, করুণার ভয় হইতেছে-- 'এইবার এই বুঝি আমার কাছে আসিবে, ইহার বুঝি কোনো দুরভিসন্ধি আছে!' বেলা প্রায় তিন প্রহর হইবে, এখনো পর্যন্ত করুণা কিছু আহার করে নাই। পথশ্রমে, ধূলায়, অনিদ্রায়, অনাহারে, ভাবনায় করুণা এক দিনের মধ্যে এমন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, এমন বিষণ্ন বিবর্ণ মলিন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে দেখিলে সহসা চিনা যায় না।
ঐ একজন পথিক আসিতেছে। দেখিয়া ভালো মনে হইল না। করুণার দিকে তার ভারি নজর-- বিদ্যাসুন্দরের মালিনী-মাসির সম্পর্কের একটা গান ধরিল-- কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহর রসিকতা করিবার ভালো অবসর নয় বুঝিয়া সে তো গান গাইতে গাইতে পিছন ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। আর-কেজন, আর-একজন, আর-একজন-- এইরূপ এক এক করিয়া কত পথিক চলিয়া গেল। এ পর্যন্ত করুণা ভদ্র পথিক একজনও দেখিতে পায় নাই। কিন্তু কী সর্বনাশ। ওই একজন প্যান্টালুন-চাপকান-ধারী আসিতেছে। অনেক সময়ে ভদ্রলোকদের (ভদ্র কথা সাধারণ অর্থে যেরূপে ব্যবহৃত হয়) যত ভয় হয় এত আর কাহাদেরও নয়। ঐ দেখো, করুণা যে গাছের তলায় বসিয়াছিল সেই দিকেই আসিতেছে। করুণা তো ভয়ে আকুল, মাটির দিকে চাহিয়া থরথর কাঁপিতে লাগিল। পথিকটি তো, বলা নয় কহা নয়, অতি শান্ত ভাবে আসিয়া, সেই গাছের তলাটিতে আসিয়া বসিল কেন। বসিতে কি

আর জায়গা ছিল না। পথের ধারে কি আর গাছ ছিল না।
পথিকটি স্বরূপবাবু। স্বরূপবাবুর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক টান ছিল তাহারই আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া গাছের তলায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি জানতেন না যে করুণাকে সেখানে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যখন করুণাকে দেখিলেন, চিনিলেন। তখন তাঁহার বিস্ময়ের ও আনন্দের অবধি রহিল না। করুণা দেখে নাই পথিকটি কে। সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে উঠিয়া যাইবে-যাইবে মনে করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। কিছুক্ষণ তো বিস্ময় ও আনন্দের তোড় সামলাইতে গেল, তার পর স্বরূপ অতি মধুর গদগদ স্বরে কহিলেন, "করুণা !"
করুণা এই সম্বোধন শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল, পথিকের দিকে চাহিল, দেখিল স্বরূবাবু ! তাহার চেয়ে একটা সাপ যদি দেখিত করুরা কম ভয় পাইত।
করুণা কিছুই উত্তর দিল না। স্বরূপ অনেক কথা বলিতে লাগিল, এ কয় রাত্রি সে করুণার জন্যে কত কষ্ট পাইয়াছিল তাহার সমস্ত বর্ণনা করিল। সেই সুখরাত্রে তাহাদের প্রেমালাপের যখন সবে সূত্রপাত হইয়াছিল, এমন সময়ে ভঙ্গ হওয়াতে অনেক দুঃখ করিল। সে অতি হতভাগ্য, বিধাতা তাহাকে চিরজীবন দুঃখী করিবার জন্যই বুঝি সৃষ্টি করিয়াছেন-- তাহার কোনো আশাই সফল হয় না। অবশেষে, করুণা নরেন্দ্রের বাড়ি হইতে যে বাহির হইয়া আসিয়াছে, ইহা লইয়া অনেক আনন্দ প্রকাশ করিল। কহিল-- আরো ভালোই হইয়াছে, তাহাদের দুইজনের যে প্রেম, যে স্বর্গীয় প্রেম, তাহা নিষ্কন্টকে ভোগ করিতে পারিবে। আরো এমন অনেক কথা বলিল, তাহা যদি লিখিয়া দেওয়া যাইত তাহা হইলে অনেক বড়ো বড়ো নভেলের রাজপুত ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য মহা মহা নায়কের মুখে স্বচ্ছন্দে বসানো যাইত। কিন্তু করুণা তাহার রসাস্বাদন করিতে পারে নাই।
স্বরূপ এলাবাহাদে যাইবে, তাই স্টেশনে যাইতেছিল। পথের মধ্যে এই-সকল ঘটনা। স্বরূপ প্রস্তাব করিল করুণা তাহার সঙ্গে পশ্চিমে চলুক, তাহা হইলে আর কোনো ভাবনা ভাবিতে হবে না। করুণা কাল রাত্রি হইতে ভাবিতেছিল কোথায় যাইবে, কী করিবে। কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। আজিকার দিন তো প্রায় যায়-যায়-- রাত্রি আসিবে, তখন কী করিবে, কত প্রকার লোক পথ দিয়া যাওয়া-আসা করিতেছে, এই-সকল নানান ভাবনার সময় এ প্রস্তাবটা করুণার মন্দ লাগিল না। ছেলেবেলা হইতে যে চিরকাল গৃহের বাহিরে কখনো যায় নাই, সে এই অনাবৃত পৃথিবীর দৃষ্টি কী করিয়া সহিবে বলো। সে একটা আশ্রয় পাইলে, লোকের চোখের আড়াল হইতে পারিলে বাঁচে। তার মনে হইতেছে, যেন সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহা ছাড়া করুণা এমন শ্‌রান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে আর সে সহিতে পারে না। একবার মনে করিল স্বরূপের প্রস্তাবে সায় দিয়া যাইবে। কিন্তু স্বরূপের উপর তাহার এমন একটা ভয় আছে যে পা আর উঠিতে চায় না। করুণা ভাবিল, 'এই গাছের তলায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকি, না খাইয়া না দাইয়া মরিয়া যাইব।' কিন্তু রক্‌মাংসের শরীরে কত সহিবে বলো-- এ ভাবনা আর বেশিক্ষণ স্থান পাইল না। স্বরূপের প্রস্তাবে সম্মত হইল। সন্ধ্যা হইল। করুণা ও স্বরূপ এখন ট্রেনের মধ্যে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

স্বরূপ ও করুণা কাশীতে আছে। করুণার দুরবস্থা বলিবার নহে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিয়া সে যে কী অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে তাহা সেই জানে। স্বরূপের ভ্রম অনেক দিন হইল ভাঙিয়াছে, এখন বুঝিয়াছে করুণা তাহাকে ভালোবাসে না। সে ভাবিতেছে, 'একি উৎপাত ! এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম-- সকলই ব্যর্থ হইল !' সে যে বিরক্ত হইয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। সে মনে করিয়াছিল এতদিন কবিতায় যাহা লিখিয়া আসিয়াছে, কল্পনায় চিত্র করিয়াছে, আজ সেই প্রেমের সুখ উপভোগ করিবে। কিন্তু সে আসিলে করুণা ভয়ে জড়োসড়ো আড়ষ্ট হইয়া মরিয়া যায়, তাহার সঙ্গে কথাই কহে না। স্বরূপ ভাবিল, 'একি উৎপাত ! এ গলগ্রহ বিদায় করিতে পারিলে যে বাঁচি।' ভাবিল দিন-কতক কাছে থাকিতে থাকিতেই ভালোবাসা হইবে। স্বরূপ তো তাহার যথাসাধ্য করিল, কিন্তু

করুণার ভালোবাসার কোনো চিহ্ন দেখিল না।

করূণা বেচারির তো আরাম বিশ্রাম নাই। এক তো সর্বক্ষণ পরের বাড়িতে অচেনা পুরুষের সঙ্গে আছে বলিয়া সর্বদাই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে। তাহা ছাড়া স্বরূপের ভাব-গতিক দেখিয়া সে তো ভয়ে আকুল--সে কাছে বসিয়া গান গায়, কবিতা শুনাইতে থাকে, মনের দুঃখ নিবেদন করে, অবশেষে মহা রুক্ষভাবে গাড়িভাড়ার টাকার জন্য নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণা যে কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না, ভয়ে বেচারি সারা হইতেছে। স্বরূপ রাত দিন খিট্ খিট্ করে, এমন-কি করুণাকে মাঝে মাঝে ধম্‌কাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণার কিছু বলিবার মুখ নাই, সে শুধু কাঁদিতে থাকে।

এইরূপে কত দিন যায়, স্বরূপের এলাহাবাদে যাইবার সময় হইয়াছে। সে ভাবিতেছে, 'এখন করুণাকে লইয়া কী করি। এইখানে কি ফেলিয়া যাইব। না, এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম, এতদিন রাখিলাম, অবশেষে কি ফেলিয়া যাইব। আরো দিন-কতক দেখা যাক।'

অনেক ভাবিয়া-সাবিয়া করুণাকে তো ডাকিল। করুণা ভাবিল, 'যাইব কি না। কিন্তু না যাইয়াই বা কী করি। এখানে কোথায় থাকিব। এত দূর দেশে অচেনা জায়গায় কার কাছে যাইব। দেশে থাকিতাম তবু কথা থাকিত।'

করুণা চলিল। উভয়ে স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ি ছাড়িতে এখনো দেরি আছে। জিনিসপত্র পুঁটুলি-বোঁচকা লইয়া যাত্রিগণ মহা কোলাহল করিতেছে। কানে-কলম-গোঁজা রেলওয়ে ক্লার্ক্‌গণ ভারি উঁচু চালে ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ফর্ ফর্ করিয়া বেড়াইতেছেন। পান সোডাওয়াটার নানাপ্রকার মিষ্টান্নের বোঝা লইয়া ফেরিওয়ালারা আগামী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপ তো অবস্থা। এমন সময়ে একজন পুরুষ করুণার পাশে সেই বেঞ্চে আসিয়া আসিয়া বসিল। করুণা উঠিয়া যাইবে-যাইবে করিতেছে, এমন সময়ে তাহার পার্শ্বস্থ পুরুষ বিস্ময়ের স্বরে কহিয়া উঠিল, "মা তুমি যে এখানে!"

করুণা পণ্ডিতমহাশয়ের স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। অনেক্ষণ কিছু বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ নির্জল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, কাঁদিয়া ফেলিয়া। কাঁদিতে কাঁদেতে কহিল, "সার্বভৌমমহাশয়, আমার ভাগ্যে কী ছিল!"

পণ্ডিতমহাশয় তো আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "মা, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তাহার জন্য আর ভাবিয়ো না। আমি প্রয়াগে যাইতেছি, আমার সঙ্গে আইস। পৃথিবীতে আর আমার কেহই নাই--যে কয়টা দিন বাঁচিয়া আছি ততদিন আমার কাছে থাকো, ততদিন আর তোমার কোনো ভাবান নাই।"

করুণা অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে নিধি আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধি পণ্ডিতমহাশয়ের খরচে কাশী দর্শন করিতে আসিয়াছেন। পণ্ডিতমহাশয় তজ্জন্য নিধির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছেন। তিনি বলেন, নিধির ঋণ তিনি এ জন্মে শোধ করিতে পারিবেন না। করুণাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল ; কহিল, "ভট্টাচার্যমশায়, একটা কথা আছে।"

পণ্ডিতমহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া গেলেন। নিধি কহিল।, "ঐ বাবুটিকে দেখিতেছেন ?" পণ্ডিতমহাশয় চাহিয়া দেখিলেন--স্বরূপ। নিধি কহিল, "দেখিলেল ! করুণার ব্যবহারটা একবার দেখিলেন ! ছি-ছি, স্বর্গীয় কর্তার নামটা একেবারে ডুবাইল !"

পণ্ডিতমহাশয় অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে হাত উল্‌টাইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন--

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

নিধি কহিল, "আহা, নরেন্দ্র এমন ভালো লোক ছিল। ওই রাক্ষসীই তো তাহাকে নষ্ট করিয়াছে।"

নরেন্দ্র যে ভালো লোক ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয়ের সংশয় ছিল না, এখন যে খারাপ হইয়া

গিয়াছে তাহারো প্রমাণ পাইয়াছেন, কিন্তু এতক্ষণে কেন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহার কারণটা জানিতে পারিলেন। পণ্ডিতমহাশয়ের স্ত্রীজাতির উপর দারুণ ঘৃণা জন্মাইল। পণ্ডিতমহাশয় ভাবিলেন, আর না--স্ত্রীলোকেই তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছে, স্ত্রীজাতিকে আর বিশ্বাস করিবেন না।

নিধি লাল হইয়া কহিল, "দেখুন দেখি, মহাশয়, পাপাচরণ করিবার আর কি স্থান নাই। এই কাশীতে!" এ কথা পণ্ডিতমহাশয় এতক্ষণ ভাবেন নাই। শুনিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে অবাক হইয়া নিধির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন ; ভাবিলেন, 'সত্যই তো!'

একটা ঘন্টা বাজিল, মহা ছুটাছুটি চেঁচামেচি পড়িয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় বেঞ্চের কাছে বোঁচকা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি লইতে গেলেন। এমন সময় স্বরূপ তাড়াতাড়ি করুণাকে ডাকিতে আসিল--পণ্ডিতমহাশয়কে দেখিয়া সট্ করিয়া সরিয়া পড়িল। করুণা কাতরস্বরে পণ্ডিতমহাশয়কে কহিল, "সার্বভৌমমহাশয়, আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না।"

পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, "মা, অনেক প্রতারণা সহিয়াছি--মনে করিয়াছি বৃদ্ধবয়সে আর কোনো দিকে মন দিব না-- দেবসেবায় কয়েকটি দিন কাটাইয়া দিব।"

করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতমহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল ; কহিল, "আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না--আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না।"

পণ্ডিতমহাশয়ের নেত্রে অশ্রু পূরিয়া আসিল ; ভাবিলেন, 'যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে--ইহাকে তো ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।'

নিধি ছুটিয়া আসিয়া মহা একটা ধমক দিয়া কহিল, "এখানে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে কী হইবে। গাড়ি যে চলিয়া যায়!"

এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের হাত ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া একটা গাড়ির মধ্যে পূরিয়া দিল। করুণা অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া মুখচক্ষু বিবর্ণ হইয়া সেইখানে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। স্বরূপের দেখাসাক্ষাৎ নাই, সে গোলেমালে অনেক ক্ষণ হইল গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় অঙ্কুশের তাপে আর্তনাদ করিয়া লৌহময় গজ হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইল। স্টেশনে আর বড়ো লোক নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে মহেন্দ্রের নিকট হইতে যে-সকল পত্র পাইয়াছিলাম, তাহার একখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম--

ভাই! যে কষ্টে, যে লজ্জায়, যে আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় পাগল হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিলাম তাহা তোমার কাছে গোপন করি নাই। সেই আঁধার রাত্রে বিজন পথ দিয়া যখন যাইতেছিলাম--কোনো কারণ নাই, কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো গম্য স্থান নাই--তখন কেন যাইতেছি, কোথায় যাইতেছি কিছুই ভাবি নাই। মনে করিয়াছিলাম এ পথের যেন অন্ত নাই, এমনি করিয়াই যেন আমাকে চিরজীবন চলিতে হইবে-- চলিয়া, চলিয়া, চলিয়া তবু পথ ফুরাইবে না--রাত্রি পোহাইবে না। মনের ভিতর কেমন এক প্রকার ঔদাস্যের অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু রাত্রের অন্ধকার যত হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, দিনের কোলাহল যতই জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই আমার মনের আবেগ কমিয়া আসিল। তখন ভালো করিয়া সমস্ত ভাবিবার সময় আসিল। কিন্তু তখনো দেশে ফিরিবার জন্য এক তিলও ইচ্ছা হয় নি। কত দেশ দেখিলাম, কত স্থানে ভ্রমণ করিলাম, কত দিন কত মাস চলিয়া গেল, কিন্তু কী দেখিলাম কী করিলাম কছি যদি মনে আছে! চোখের উপর কত পর্বত নদী অরণ্য মন্দির অট্টালিকা গ্রাম উঠিত, কিন্তু সে-সকল যেন কী। কিছুই নয়। যেন স্বপ্নের মতো, যেন মায়ার মতো, যেন মেঘের পর্বত-অরণ্যের মতো। চোখের উপর পড়িত তাই দেখিতাম, আর কিছুই নহে। এইরূপ করিয়া যে কত দিন গেল তাহা বলিতে পারি না--আমার মনে হইয়াছিল এক বৎসর হইবে, কিন্তু পরে গণনা করিয়া দেখিলাম চার মাস। ক্রমে ক্রমে আমার মন শান্ত হইয়া আসিয়াছে।

এখন ভবিষ্যৎ ও অতীত ভাবিবার অবসর পাইলাম। আমি এখন লাহোরে আসিয়াছি। এখানকার একজন বাঙালিবাবুর বাড়িতে আশ্রয় লইলাম, ও অল্প অল্প করিয়া ডাক্তারি করিতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার মন্দ আয় হইতেছে না। কিন্তু আয়ের জন্য ভাবি না ভাই, আমার হৃদয়ে যে নূতন মনস্তাপ উত্থিত হইয়াছে তাহাতে যে আমাকে কী অস্থির করিয়া তুলিয়াছে বলিতে পারি না। আমার নিজের উপর যে কী ঘৃণা হইয়াছে তাহা কী করিয়া প্রকাশ করিব। যখন দেশে ছিলাম তখন রজনীর জন্যে একদিনও ভাবি নাই, যখন দেশ ছাড়িয়া আসিলাম তখনো এক মুহূর্তের জন্য রজনীর ভাবনা মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু দেশ হইতে যত দূরে গিয়াছি--যত দিন চলিয়া গিয়াছে--হতভাগিনী রজনীর কথা ততই মনে পড়িয়াছে--আপনাকে ততই মনে পড়িয়াছে--আপনাকে ততই নিষ্ঠুর পিশাচ বলিয়া মনে হইয়াছে। আমার ইচ্ছা করে এখনই দেশে ফিরিয়া যাই, তাহাকে যত্ন করি, তাহাকে ভালোবাসি, তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। সে হয়তো এতদিনে আমার কলঙ্কের কথা শুনিয়াছে। আমি তাহার কাছে কী বলিয়া দাঁড়াইব। না ভাই, আমি তাহা পারিব না।...

মহেন্দ্র আমি দেখিতেছি, যে-সকল বাহ্য কারণে মহেন্দ্রের রজনীর উপর বিরাগ ছিল, সে-সকল কারণ হইতে দূরে থাকিয়া মহেন্দ্র একটু ভাবিবার অবসর পাইয়াছে। যতই তাহার আপনার নিষ্ঠুরাচরণ মনে উদিত হইয়াছে ততই রজনীর উপর মমতা তাহার দৃঢ়মূল হইয়াছে। মহেন্দ্র এখন ভাবিয়াই পাইতেছে না তাহাকে কেন ভালোবাসে নাই--এমন মৃদু কোমল, স্নিগ্ধ স্বভাব, তাহাকে ভালোবাসে না এমন পিশাচ আছে! কেন, তাহাকে দেখিতেই বা কী মন্দ! মন্দ? কেন, অমন সুন্দর স্নেহপূর্ণ চক্ষু! অমন কোমল ভাবব্যঞ্জক মুখশ্রী! ভাব লইয়া রূপ, না, বর্ণ লইয়া? রজনীর যাহা-কিছু ভালো তাহাই মহেন্দ্রের মনে পড়িতে লাগিল, আর তাহার যাহা-কিছু মন্দ তাহাও মহেন্দ্র ভালো বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে রজনীকে যতই ভালো বলিয়া বুঝিল, আপনাকে ততই পিশাচ বলিয়া মনে হইল।

মহেন্দ্রের সেখানে বিলক্ষণ পশার হইয়াছে। মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জন করিত। কিন্তু প্রায় সমস্তই রজনীর কাছে পাঠাইয়া দিত, নিজের জন্য এত অল্প টাকা রাখিয়া দিত যে, আমি ভাবিয়া পাই না কী করিয়া তাহার খরচ চলিত!

অনেক দিন হইয়া গেছে মহেন্দ্রের বাড়ি আসিতে বড়োই ইচ্ছা হয়, কিন্তু সকল কথা মনে উঠিলে আর ফিরিয়া আসিতে পা সরে না। মহেন্দ্র একটা চিঠি পাইয়াছে, পাইয়া অবধি বড়োই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই মোহিনীর চিঠি। চিঠির শেষ ভাগে লিখা আছে--'আপনি যদি রজনীকে নিতান্তই দেখিতে না পারেন, যদি রজনী এখানে আছে বলিয়া আপনি নিতান্তই আসিতে না চান তবে আপনার আশঙ্কা করিবার বিশেষ কোনো কারণ, সে তাহার দিদির বাড়ি চলিয়া যাইবে। রজনী লিখিতে জানে না বলিয়া আমি তাহার হইয়া লিখিয়া দিলাম। সে লিখিতে জানিলেও হয়তো আপনাকে লিখিতে সাহস করিত না।'

ইহার মৃদু তিরস্কার মহেন্দ্রের মর্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়াছে। সে স্থির করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া যাইবে।

রজনীর শরীর দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্নতর হইতেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে মোহিনীর গলা ধরিয়া বলিল, "দিদি আর আমি বেশিদিন বাঁচিব না।"

মোহিনী কহিল, "সেকি রজনী, ও কথা বলিতে নাই।'

রজনী বলিল, "হাঁ দিদি, আমি জানি, আর আমি বেশি দিন বাঁচিব না। যদি এর মধ্যে তিনি আসেন তবে তাঁকে এই টাকাগুলি দিয়ো। তিনি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতেন, কিন্তু আমার খরচ করিবার দরকার হয় নাই, সমস্ত জমাইয়া রাখিয়াছি।"

মোহিনী অতিশয় স্নেহের সহিত রজনীর মুখ তাহার বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "চুপ কর্, ওসব কথা বলিস নে।"

মোহিনী অনেক কষ্টে অশ্রুসম্বরণ করিয়া মনে মনে কহিল, 'মা ভগবতি, আমি যদি এর দুঃখের কারণ হয়ে থাকি, তবে আমার তাতে কোনো দোষ নাই।'

হাত-অবসর পাইলেই রজনীর শাশুড়ি রজনীকে লইয়া পড়িতেন, নানা জন্তুর সহিত তাহার রূপের তুলনা করিতেন, আর বলিতেন যে বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া অবধিই তিনি জানিতেন যে এইরূপ একটা দুর্ঘটনা হইবে--তবে জানিয়া শুনিয়া কেন যে বিবাহ দিলেন সে কথা উত্থাপন করিতেন না। রজনী না থাকিলে মহেন্দ্রবিয়োগে তাঁহার মাতার অধিকতর কষ্ট হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই-যে মাঝে মাঝে মন খুলিয়া তিরস্কার করিতে পান, ইহাতে তাঁহাতে মন অনেকটা ভালো আছে। মহেন্দ্রের মাতার স্বাভাব যত দূর জানি তাহাতে তো এক-একবার আমার মনে হয়--এই-যে তিরস্কার করিবার তিনি সুযোগ পাইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় মহেন্দ্রের বিয়োগও তিনি ভাগ্য বলিয়া মানেন। মহেন্দ্রের অবস্থান কালে, রজনী যেদিন কোনো দোষ না করিত সেদিন মহেন্দ্রের মাতা মহা মুশকিলে পড়িয়া যাইতেন। অবশেষে ভাবিয়া ভাবিয়া দুই বৎসরের পুরানো কথা লইয়া তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া আসিতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁহার তিরস্কারের ভাণ্ডার সর্বদাই মজুত রহিয়াছে, অবসর পাইলেই হয়। ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের মা মহেন্দ্রকে এক লোভনীয় পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার 'বাবাকে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে কহিয়াছেন ও সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার জন্য একটি সুন্দরী কন্যা অনুসন্ধান করা যাইতেছে। এই চিঠি পাইয়া মহেন্দ্রের আপনার উপর দ্বিগুণ লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে--'তবে সকলেই মনে করিয়াছে আমি রূপের কাঙাল ! রজনী দেখিতে ভালো নয় বলিয়াই আমি তাহার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি ? লোকের কাছে মুখ দেখাইব কোন্ লজ্জায়।'

কিন্তু রজনীর আজকাল অল্প তিরস্কারই অত্যন্ত মনে লাগে, আগেকার অপেক্ষাও সে কেমন ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর যতই খারাপ হইতেছে ততই সে ভয়ে ত্রস্ত ও তিরস্কারে অধিকতর ব্যথিত হইয়া পড়িতেছে, ক্রমাগত তিরস্কার শুনিয়া শুনিয়া আপনাকে সত্য-সত্যই দোষী বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। মোহিনী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাহার কাছে আসিত--প্রত্যহ তাহাকে যথাসাধ্য যত্ন করিত ও প্রত্যহ দেখিত সে দিনে দিনে অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। একদিন রজনী সংবাদ পাইল মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। আহলাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার কিসের আহলাদ ! মহেন্দ্র তো তাহাকে সেই ঘৃণাচক্ষে দেখিবে। তাহা হউক, কিন্তু তাহার জন্য মহেন্দ্র যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে কষ্ট পাইতেছে এ আত্মগ্লানির যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল--যে কারণেই হউক, মহেন্দ্র যে বিদেশে গিয়া কষ্ট পাইতেছে ইহা রজনীর অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কাশীর স্টেশনে করুণা-সংক্রান্ত যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছিল, একজন ভদ্রলোক তাহা সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। স্বরূপকে দেখিয়া তিনি কেমন লজ্জিত ও সংকুচিত হইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন সকলে চলিয়া গেল এবং করুণা মূর্ছিত হইয়া পড়িল তখন তিনি তাহাকে একটা গাড়িতে তুলিয়া তাঁহার বাসাবাড়িতে লইয়া যান--তাঁহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যাওয়া হইল না। করুণার মুখ দেখিয়া, এমন কে আছে যে তাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে ? মহেন্দ্রও তাহাকে সন্দেহ করে নাই। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম--সেই ভদ্রলোকটি মহেন্দ্র। লাহোর হইতে আসিবার সময় একবার কাশীতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই-সমস্ত ঘটনা ঘটে। করুণা চেতনা পাইলে মহেন্দ্র তাহাকে তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিঁাসা করিলেন। মহেন্দ্রের মুখে এমন দয়ার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল যে, করুণা শীঘ্রই সাহস পাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিল এবং ঠিক সে যেমন করিয়া ভবিকে জিজ্ঞাসা করিত তেমন করিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন নরেন্দ্র তাহার উপর অমন রাগ করিল। মহেন্দ্র বালিকার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না--কিন্তু এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। নরেন্দ্রকে মহেন্দ্র বেশ চেনে, সে সমস্ত ঘটনা বেশ বুঝিতে পারিল। পণ্ডিতমহাশয় যে কেন তাহাকে অমন করিয়া ফেলিয়া গেলেন তাহাও করুণা ভাবিয়া পাইতেছিল না, অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাও মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল। মহেন্দ্র তাহার যথার্থ কারণ যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা গোপন

করিয়া নানারূপে বুঝাইয়া দিলেন।
এখন করুণাকে লইয়া যে কী করিবে মহেন্দ্র তাহাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল তাহাদের বাড়িতেই লইয়া যাইবে। মহেন্দ্র করুণার নিকট তাহার বাড়ির বর্ণনা করিল। কহিল--তাহাদের বাড়ির সামনেই একটি প্রাচীর-দেওয়া বাগান আছে, বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পুষ্কুরিণীর উপরে একটি বাঁধানো শানের ঘাট। কহিল--তাহাদের বাড়িতে গেলে করুণা তাহার একটি দিদি পাইবে, তেমন স্নেহশালিনী--তেমন কোমলহৃদয়া--তেমন ক্ষমাশীলা (আরো অসংখ্য বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছিল) দিদি কেহই কখনো পায় নাই। করুণা অমনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল সেখানে কি ভবির দেখা পাইবে ! মহেন্দ্র ভবির সন্ধান করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন করুণা তাঁহাকে ভ্রাতার মতো দেখিবে কি না, করুণার তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। যাহা হউক, এত দিন পরে করুণার মুখ প্রফুল্ল দেখিলাম, এতদিন পরে সে তবু আশ্রয় পাইল। কিন্তু বারবার করুণা মহেন্দ্রকে পণ্ডিতমহাশয়ের তাহার উপর রাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে।
অবশেষে তাহারা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কাশী পরিত্যাগ করিয়া চলিল। কে কী বলিবে, কে কী করিবে, কখন কী হইবে--এই-সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে ও যদি কেহ কিছু বলে তবে তাহার কী উত্তর দিবে, যদি কেহ কিছু করে তবে তাহার কী প্রতিবিধান করিবে, যদি কখনো কিছু হয় তবে সে অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিবে--এই-সমস্ত ঠিক করিতে করিতে মহেন্দ্র গ্রামের রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল। লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া, সংকোচে অভিভূত হইয়া, পথিকদিগের চক্ষু এড়াইয়া ও কোনোমতে পথ পার হইয়া গৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল।
কতবার সাত-পাঁচ করিয়া পরে প্রবেশ করিল। দাদাবাবুকে দেখিয়াই ঝি ঝাঁটা রাখিয়া ছুটিয়া বড়োমাকে খবর দিতে গেল। বড়োমা তখন রজনীর সুমুখে বসিয়া রজনীর রূপের ব্যাখ্যান করিতেছিলেন, এমন মসয়ে খবর পাইলেন যে আর-একটি নূতন বধূ লইয়া তাঁহার বাবা ঘরে আসিয়াছেন।
মহেন্দ্রের ও করুণার সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইল, যখন সকলে মিলিয়া উলু দিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মহেন্দ্র তাঁহাদিগকে করুণা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। সে-সমস্ত বৃত্তান্ত মহেন্দ্রের মাতার বড়ো ভালো লাগে নাই। মহেন্দ্রের সমুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেই রাত্রে মহেন্দ্রের পিতার সহিত তাঁহার ভারি একটা পরামর্শ হইয়া গিয়াছিল ও অবশেষে রজনী পোড়ারমুখীই যে এই-সমস্ত বিপত্তির কারণ তাহা অবধারিত হইয়া গিয়াছিল। এই কথাটা লইয়া মহেন্দ্রের পিতার অতিরিক্ত আনা-দুয়েকের তামাকু ব্যয় হইয়াছিল ও দুই-চারিজন বৃদ্ধ বিজ্ঞ প্রতিবাসীদিগের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর অধিক কিছু দুর্ঘটনা হয় নাই।
রজনী তাহার দিদির বাড়ি যাইবার সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাঁহার শ্বশুর শাশুড়িরা এই বন্দোবস্তে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রজনী বড়ো দুর্বল বলিয়া এখনো সমাধা হইয়া উঠে নাই। এই খবরটি আসিয়াই মহেন্দ্র তাঁহার মাতার নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন। আশ্চর্যের স্বরে কহিলেন, "দিদির বাড়ি যাইবে, তার অর্থ কী। আমি আসিলাম আর অমনি দিদির বাড়ি যাইবে !"
মহেন্দ্রের মাও অবাক্, মহেন্দ্রের পিতা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন--পরে ঠুঙি হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিলেন এবং মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন--যেন তিনি মিলাইয়া দেখিতে চান যে এ মহেন্দ্রের সহিত পূর্বকার মহেন্দ্রের কোনো আদল আছে কি না ! এ মহেন্দ্র ঝুঁটা মহেন্দ্র কি না !
মহেন্দ্র অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ রজনীর ঘরে চলিয়া গেলেন ও কর্তা গৃহিণীতে মিলিয়া ফুস্ ফুস্ করিয়া মহাপরামর্শ করিতে লাগিলেন।
রজনী মহেন্দ্রকে দেখিয়া মহা শশব্যস্ত হইয়া পড়িল, কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে মনে করিতে লাগিল, মহেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া কি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে ! তাহার তাড়াতাড়ি বলিবার ইচ্ছা হইল যে, 'আমি এখনই যাইতেছি, আমার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে।' যখন সে এই গোলমালে পড়িয়া কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না, তখন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল। কী ভাগ্য ! বিষণ্ন স্বরে

জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি আজই দিদির বাড়ি যাবে। কেন রজনী।"

আর কি উত্তর দিবার জো আছে।--"আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু তাহা কি ক্ষমা করিবে না।"

ওকি মহেন্দ্র ! অমন করিয়া বলিয়ো না, রজনীর বুক ফাটিয়া যাইতেছে।--"বলো, তাহা কি ক্ষমা করিবে না।"

রজনীর উত্তর দিবার কি ক্ষমতা আছে। সে পূর্ণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "একবার বলো ক্ষমা করিলে।"

রজনী ভাবিল--সেকি কথা। মহেন্দ্র কেন ক্ষমা চাহিতেছেন। সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, সেই মহেন্দ্রের নিকট অপরাধী, কেননা তাহার জন্যই মহেন্দ্র এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, গৃহ ত্যাগ করিয়া কত বৎসর বিদেশে কাল যাপন করিয়াছেন, সে কোথায় মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা চাহিবে--তাহা না হইয়া একি বিপরীত ! ক্ষমা চাহিবে কী, সে নিজেই ক্ষমা চাহিতে সাহস করে নাই। সে কি ক্ষমার যোগ্য। মহেন্দ্র রজনীর দুর্বল মস্তক কোলে তুলিয়া লইল। রজনী ভাবিল, 'এই সময়ে যদি মরি তবে কী সুখে মরি !" তাহার কেমন সংকোচ বোধ হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের ক্রোড় তাহার নিকট যেন ভিখারির নিকট সিংহাসন। মহেন্দ্র তাহাকে কত কী কথা বলিল, সে-সকল কথার উত্তর দিতে পারিল না। সে ভাবিল, 'এ মধুর স্বপ্ন চিরস্থায়ী নহে--এই মুহূর্তে মরিতে পাইলে কী সুখী হই ! কিন্তু এ অবস্থা কতক্ষণ রহিবে !' রজনীর এ সংকোচ শীঘ্র দূর হইল। রজনী তাহার কোলে মাথা রাখিয়া কতক্ষণ কত কী কথা কহিল--কত অশ্রুজল, কত কথা, কত হাসি, সে বলিবার নহে।

মহেন্দ্র যখন উঠিয়া যাইতে চাহিল তখন রজনী তাহাকে আর-একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিল, যাহা আর কখনো করিতে সাহস করে নাই। রজনীর একি পরিবর্তন ! যে সুখ সে কখনো আশা করে নাই, আপনাকে যে সুখ পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করে নাই, সেই সুখ সহসা পাইয়াছে--আহ্লাদে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল-- সে কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

সেই সন্ধ্যাবেলাই সে মোহিনীর বাড়িতে গেল, তাড়াতাড়ি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে বসিল। মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রজনী কী হয়েছে।"

সে মনে করিল মহেন্দ্র না জানি আবার কী অন্যায়াচরণ করিয়াছে।

রজনী তাহাকে সকল কথা বলিতে লাগিল-- শুনিয়া মোহিনীও আহ্লাদে কাঁদিতে লাগিল। রজনীর দুই-এক মাসের মধ্যে যে কোনো ব্যাধি বা দুর্বলতা হইয়াছিল তাহার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর কখনো রজনীর ঘরকন্নার কাজে এত উৎসাহ কেহ দেখে নাই-- শাশুড়ি মহা উগ্রভাবে কহিলেন, "হয়েছে, হয়েছে, ঢের হয়েছে, আর গিন্নিপনা করে কাজ নেই, দু দিন উপোস করে আছেন, সবে আজ ভাত খেয়েছেন, ওঁর গিন্নিপনা দেখে আর বাঁচি নে।"

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক-- রজনী যে দুদিন উপোস করিয়াছিল সে দুদিন কাজ করিতে পারে নি বলিয়া তাহার শাশুড়ি মহা বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও ভবিষ্যতে যখনই রজনীর দোষের অভাব পড়িবে সেই দুই দিনের কথা লইয়া আবার বক্তৃতা যে দিবেন ইহাও নিশ্চিত, এ বিষয়ে কোনো পাঠকের সন্দেহ উপস্থিত না হয়।

দেখিতে দেখিতে করুণার সহিত রজনীর মহা ভাব হইয়া গেল। দুই জনের ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া মহা মনের কথা পড়িয়া গেল-- তাহাদের কথা আর ফুরায় না। তাহাদের স্বামীদের কত দিনকার সামান্য যত্ন, সামান্য আদরটুকু তাহারা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছে-- তাহাই কত মহান ঘটনার মতো বলাবলি করিত। কিন্তু এ বিষয়ে তো দুই জনেরই ভাণ্ডার অতি সামান্য, তবে কী যে কথা হইত তাহারাই জানে। হয়তো সে-সব কথা লিখিলে পাঠকেরা তাহার গাম্ভীর্য বুঝিতে পারিবেন না, হয়তো হাসিবেন, হয়তো মনে করিবেন এ-সব কোনো কাজেরই কথা নয়। কিন্তু সে বালিকারা যে-সকল কথা লইয়া অতি গুপ্তভাবে অতি সবধানে আন্দোলন করিয়াছে তাহাই লইয়া যে সকলে হাসিবে, সকল কথা তুচ্ছভাবে উড়াইয়া দিবে তাহা মনে করিলে কষ্ট হয়। কিন্তু করুণার সঙ্গে রজনী পারিয়া উঠে না-- সে

এক কথা সাতবার করিয়া বলিয়া, সব কথা একেবারে বলিতে চেষ্টা করিয়া, কোনো কথাই ভালো করিয়া বুঝাইতে না পারিয়া, রজনীর এক প্রকার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই কথা ফুরায় নাই তো কেমন করে সে রজনীর কথা শুনিবে ! তাহার কি একটা-আধটা কথা। তাহার পাখির কথা তাহার ভবির কথা, তাহার কাঠবিড়ালির গল্প-- সে কবে কী স্বপ্ন দেখিয়াছিল-- তাহার পিতার নিকট দুই রাজার কী গল্প শুনিয়াছিল-- এ-সমস্ত কথা তাহার বলা আবশ্যক। আবার বলিতে বলিতে যখন হাসি পাইত তখন তাহাই বা থামায় কে। আর, কেন যে হাসি পাইল তাহাই বা বুঝায় কাহার সাধ্য। রজনী-বেচারির বড়ো বেশি কথা বলিবার ছিল না, কিন্তু বেশি কথা নীরবে শুনিবার এমন আর উপযুক্ত পাত্র নাই। রজনী কিছুতেই বিরক্ত হইত না, তবে এক-কে সময়ে অন্যমনস্ক হইত বটে-- তা, তাহাতে করুণার কী ক্ষতি। করুণার বলা লইয়া বিষয়।

করুণাকে লইয়া মহেন্দ্রের মাতা বড়ো ভাবিত আছেন। তাঁহার বয়স বড়ো কম নহে, পঞ্চান্ন বৎসর--এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞতায় তিনি ভদ্রলোকের ঘরে এমন বেহায়া মেয়ে কখনো নাই, আবার তাঁহার প্রতিবেশিনীরা তাহাদের বাপের বয়সেও এমন মেয়ে কখনো দেখে নাই বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গেল। মহেন্দ্রের পিতা তামকু খাইতে খাইতে কহিতেন যে , ছেলেমেয়েরা সবাই খৃস্টান হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের মাতা কহিতেন সে কথা মিছা নয়, মহেন্দ্রের মাতা মাঝে মাঝে রজনীকে সম্বোধন করিয়া করুণার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কহিতেন, 'আজ বাগানে বড়ো গলা বাহির করা হইতেছিল ! লজ্জা করে না !' কিন্তু তাহাতে করুণা কিছুই সাবধান হয় নাই। কিন্তু এ তো করুণার শান্ত অবস্থা, করুণা যখন মনের সুখে তাহার পিতৃভবনে থাকিত তখন যদি এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞ গৃহিণী তাহাকে দেখিতেন তবে কী করিতেন বলিতে পারি না।

আবার এক-একবার যখন বিষণ্ন ভাব করুণার মনে আসিত তখন তাহার মূর্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাহার কথা নাই, গল্প নাই, সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে-- রজনী পাশে বসিয়া 'লক্ষ্মী দিদি আমার' বলিয়া কত সাধাসাধি করিলে উত্তর নাই। করুণা প্রায় মাঝে মাঝে এমনি বিষণ্ন হইত, কতক্ষণ ধীরয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে সে শান্ত হইত। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে মহেন্দ্রকে জিঁাসা করিল, "নরেন্দ্র কোথায়।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি তো জানি না।"

করুণা কহিল, "কেন জান না।"

কেন জানে না সে কথা মহেন্দ্র ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না, তবে নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে স্বীকার করিল।

কিন্তু নরেন্দ্রের অধিক সন্ধান করিতে হইল না। নরেন্দ্র কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাইয়াছে। একদিন করুণা যখন রজনীর নিকট দুই রাজার গল্প করিতে ভারি ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে ডাকে তাহার নামে একখানি চিঠি আসিল। এ পর্যন্তও তাহার বয়সে সে কখনো নিজের নামের চিঠি দেখে নাই। এ চিঠি পাইয়া করুণার মহা আহ্লাদ হইল, সে জানিত চিঠি পাওয়া এক মহা কাণ্ড, রাজা-রাজড়াদেরই অধিকার। আস্ত চিঠি ছিঁড়িয়া খুলিতে তাহার কেমন মায়া হইতে লাগিল, আগে সকলকে দেখাইয়া অনেক অনিচ্ছার সহিত লেফাফা খুলিল, চিঠি পড়িল, চিঠি পড়িয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠি মহেন্দ্রকে দিল।

নরেন্দ্র লিখিতেছেন-- 'তিন শত টাকা আমার প্রয়োজন, না পাইলে আমার সর্বনাশ, না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব। ইতি।'

করুণা কাঁদিয়া উঠিল। করুণা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "কী হবে।"

মহেন্দ্র কহিল কোনো ভাবনা নাই, এখনি টাকা লইয়া সে যাইতেছে। নরেন্দ্রের ঠিকানা চিঠিতে ঋিখা ছিল, সেই ঠিকানা-উদ্দেশ্যে মহেন্দ্র চলিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র দেশে আসিয়া অবধি মোহিনীর বড়ো খোঁজ-খপর পাওয়া যায় না। মহেন্দ্র তো তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পায় না-- 'একদিন কী অপরাধ করিয়াছিলাম তাহার জন্য কি দুই জনের এ জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইবে ?' সে মনে করিল হয়তো মোহিনী রাগ করিয়াছে, হয়তো মোহিনী তাহাকে ভালোবাসে না। পাঠকেরা শুনিলে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন না যে, মহেন্দ্র এখনো মোহিনীকে ভালোবাসে। কিন্তু মহেন্দ্রের সে ভালোবাসার পক্ষে যে যুক্তি কত, তাহা শুনিলে কাহারো আর কথা কহিবার জো থাকিবে না। সে বলে, "মানুষকে ভালোবাসিতে দোষ কী। আমি তো মোহিনীকে তেমন ভালোবাসি না, আমি তাহাকে ভগিনীর মতো, বন্ধুর মতো ভালোবাসি-- আমি কখনো তাহার অধিক তাহাকে ভালোবাসি না।' এই কথা এত বিশেষ করিয়া ও এত বার বার বলিত যে তাহাতেই বুঝা যাইত তদপেক্ষাও অধিক ভালোবাসে। সে আপনার মনকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিত, সুতরাং ঐ এক কথা তাহাকে বার বার বিশেষ করিয়া বলিতে হইতে। ঐ এক কথা বার বার বলিয়া তাহার মনকে বিশ্বাস করাইতে চাহিত, তাহার মন এক-একবার অল্প-অল্প বিশ্বাস করিত। সে বলিত, 'আপনার ভগিনীর মতো, বন্ধুর মতো যদি মোহিনী মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসে তাহাতে দোষ কী। বরং না আসিলেই দোষ। কেন, মোহিনী তো আর-সকলের সঙ্গেই দেখা করিতে পারে, তবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না কেন। যেন সত্য-সত্যই আমাদের মধ্যে কোনো সমাজবিরুদ্ধ ভাব আছে--কিন্তু তাহা তো নাই, নিশ্চয় তাহা নাই, তাহা থাকা অসম্ভব। আমি রজনীকে প্রেমের ভাবে ভালোবাসি, সকলেরই অপেক্ষা ভালোবাসি--আমি মোহিনীকে কেবল ভগিনীর মতো ভালোবাসি।' মহেন্দ্র এইরূপে মনের মধ্যে সকল কথা তোলাপাড়া করিত। এমন-কি, রজনীকেও তাহার এই-সকল যুক্তি বুঝাইয়াছিল। রজনীর বুঝিতে কিছুই গোল বাধে নাই, সে বেশ স্পস্টই বুঝিয়াছিল। সে নিজে গিয়া মোহিনীকে ঐ-সমস্ত কথা বুঝাইল, মোহিনী বিশেষ কিছুই উত্তর দিল না। মনে-মনে কহিল, 'সকলের মন জানি না, কিন্তু আমার নিজের মনের উপর আমার বিশ্বাস নাই।' মোহিনী ভাবিল-- আর না, আর এখানে থাকা শ্রেয় নহে। মোহিনী কাশী যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিল, বাড়ির লোকেরা তাহাতে অসম্মত হইল না।
কাশী যাইবার সময় করুণা ও রজনীর সহিত একবার দেখা করিল। করুণা কহিল, "তুমি কাশী যাইতেছ, যদি আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয় তবে তাঁহাকে বলিয়ো আমি ভালো আছি।" করুণা জানিত যে, পণ্ডিতমহাশয় নিশ্চয় তাহার কুশলসংবাদ পাইবার জন্য আকুল আছেন। করুণা যাহা মনে করিয়াছিল তাহা মিথ্যা নহে, নিধির পীড়াপীড়িতে রেলের গাড়িতে চড়িয়া পণ্ডিতমহাশয়ের এমন অনুতাপ হইয়াছিল যে অনেকবার তিনি চীৎকার করিয়া গাড়ি থামাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'গারোয়ান' যখন কিছুতেই ব্রাহ্মণের দোহাই মানিল না, তখন তিনি ক্ষান্ত হন। কিন্তু বার বার কাতরস্বরে নিধিকে বলিতে লাগিলেন 'কাজটা ভালো হইল না'। দুই-চার-বার এইরূপ বলিতেই নিধি মহা বিরক্ত হইয়া বিলক্ষণ একটি ধমক দিয়া উঠিল। পণ্ডিতমহাশয় নিধিকে আর-কিছু বলিতে সাহস করিলেন না ; কিন্তু গাড়ির কোণে বসিয়া এক ডিবা নস্য সমস্ত নিঃশেষ করিয়াছিলেন ও তাঁহার চাদরের এক অংশ অশ্রুজলে সম্পূর্ণভাবে ভিজাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল গাড়িতে নয়, যেখানে গিয়াছেন নিধিকে বার বার ঐ এক কথা বলিয়া বিরক্ত করিয়াছেন। কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া যখন করুণাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার আর অনুতাপের পরিসীমা রহিল না। নিধিকে ঐ এক কথা বলিয়া এমন বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, সে একদিন কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছিল।
মোহিনী কহিল, "তোমাদের পণ্ডিতমহাশয়কে তো আমি চিনি না, যদি চিনাশুনা হয়, তবে বলিব।"
করুণা একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয়কে চিনে না ! সে জানিত পণ্ডিতমহাশয়কে সকলেই চিনে। সে মোহিনীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল কোন্ পণ্ডিতমহাশয়ের কথা কহিতেছে, কিন্তু তাহাতেও যখন মোহিনী পণ্ডিতমহাশয়কে চিনিল না তখন করুণা নিরাশ ও অবাক হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে রজনীর কাছে বিদায় লইয়া মোহিনী কাশী চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বর্ষা কাল। দুই দিন ধরিয়া বাদলার বিরাম নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার রাস্তায় ছাতির অরণ্য পড়িয়া গিয়াছে। সসংকোচ পথিকদের সর্বাঙ্গে কাদা বর্ষণ করিতে করিতে গাড়ি ছুটিতেছে। মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। বড়ো রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাইয়া একটি অতি সংকীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুটা একটা খোলার ঘর ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িতেছে ও তাহার দুই প্রৌঢ়া অধিবাসিনী অনেক ক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া অবশেষে চুলাচুলি করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। ভাঙা হাঁড়ি, পচা ভাত, আমের আঁটি ও পৃথিবীর আবর্জনা গলির যেখানে সেখানে রাশীকৃত রহিয়াছে। একটি দুর্গন্ধ পুস্করিণীর তীরে আস্তাবল-রক্ষকের মহিলারা আঁচল ভরিয়া তাঁহাদের আহারের জন্য উদ্ভিজ্জ সঞ্চয় করিতেছেন। হুঁচট খাইতে খাইতে-- কখনো-বা এক-হাঁটু কাঁদায় কখনো-বা এক-হাঁটু ঘোলা জলে জুতা ও পেন্টলুন্‌টাকে পেন্সন দিবার কল্পনা করিতে করিতে-- সর্বাঙ্গে কাদামাখা দুইচারিটা কুকুরের নিকট হইতে অশ্রান্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতে মহেন্দ্র গোবর-আচ্ছাদিত একটি অতি মুমূর্ষু বাটীতে গিয়া পৌঁছিলেন। দ্বারে আঘাত কতরলেন, জীর্ণ শীর্ণ দ্বার বিরক্ত রোগীর মতো মৃদু আর্তনাদ করিতে করিতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র গৃহে ছিলেন, কিন্তু বৎসর-কয়েকের মধ্যে পুলিসের কনস্টেবল ছাড়া নরেন্দ্রের গৃহে আর-কোনো অতিথি আসে নাই-- এই জন্য দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিয়াই নরেন্দ্র অন্তর্ধান করিয়াছেন।

দ্বার খুলিয়াই মহেন্দ্র আবর্জনা ও দুর্গন্ধ-ময় এক প্রাঙ্গণে পদার্পন করিলেন। সে প্রাঙ্গণের এক পাশে একটা কূপ আছে, সে কূপের কাছে কতকগুলো আমের আঁটি হইতে ছোটো ছোটো চারা উঠিয়াছে। সে কূপের উপরে একটা পেয়ারা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণ পার হইয়া সংকুচিত মহেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন নিম্ন ও এমন স্যাঁৎসেঁতে ঘর বুঝি মহেন্দ্র আর কখনো দেখে নাই, ঘর হইতে এক প্রকার ভিজা ভাপসা গন্ধ বাহির হইতেছে। বৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগ্ন জানালায় একটা ছিন্ন দরমার আচ্ছাদন রহিয়াছে। সে গৃহের দেয়ালে যে এক কালে বালি ছিল, সে পাড়ায় এইরূপ একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এক জায়গায় ইঁটের মধ্যে একটি গর্তে খানিকটা তামাক গোঁজা আছে। গৃহসজ্জার মধ্যে একখানি অবিশ্বাসজনক তক্তা (যদি তাহার প্রাণ থাকিত তবে তাহা ব্যবহার করিলে পশুনৃশংসতানিবারিণী সভায় অনেক টাকা জরিমানা দিতে হইত)-- তাহার উপরে মললিপ্ত মসীবর্ণ একখানি মাদুর ও তদুপযুক্ত বালিশ ও সর্বোপরি স্বকার্যে অক্ষম দীনহীন একটি মশারি। গৃহে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র একটি দাসীকে দেখিতে পাইলেন। সে দাসীটি তাঁহাকে দেখিয়াই ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মৃদু ভর্ৎনার স্বরে কহিল, "কেন গো বাবু, মানুষের গায়ের উপর না পড়িলেই কি নয়।"

মহেন্দ্র তাহার নিকট হইতে অন্তত দুই হস্ত ব্যবধানে ছিলেন ও তাহার দুর্গন্ধ বস্ত্র ও ভয়জনক মুখশ্রী দেখিয়া আরো দুই হস্ত ব্যবধানে যাইবার সংকল্প করিতেছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রের যে তাহার কাছে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল, ইহা কল্পনা করিয়া দাসীটি মনে-মনে মহা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই দাসী গিয়া ভীত নরেন্দ্রকে অনেক আশ্বাস দিয়া ডাকিয়া আনিল। নরেন্দ্র মহেন্দ্রকে দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য হইল না, সে যেন তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু মহেন্দ্র নরেন্দ্রকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল-- এমন পরিবর্তন সে আর কাহারো দেখে নাই। অনাবৃত দেহ, অল্পপরিসর জীর্ণ মলিন বস্ত্রে হাঁটু পর্যন্ত আচ্ছাদিত। মুখশ্রী অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, চক্ষু জ্যোতিহীন, কেশপাশ অপরিচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল, সর্বদাই হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ণ এমন মলিন হইয়া গিয়াছে যে আশ্চর্য হইতে হয়-- তাহাকে দেখিলেই কেমন এক প্রকার ঘৃণা ও সংকোচ উপস্থিত হয়। নরেন্দ্র অতি শান্তভাবে মহেন্দ্রকে তাঁহার নিজের ও তাঁহার সংক্রান্ত সমস্ত লোকের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কাজকর্ম কিরূপ চলিতেছে তাহাও খোঁজ লইলেন। মহেন্দ্র নরেন্দ্রের এই অতি শান্তভাব দেখিয়া অত্যন্ত অবাক্‌ হইয়া গিয়াছেন-- মহেন্দ্রকে দেখিয়া নরেন্দ্র

কিছুমাত্র লজ্জা বা সংকোচ বোধ করেন নাই।
মহেন্দ্র আর কিছু না মলিয়া নরেন্দ্রের চিঠিটি তাহার হস্তে দিল। সে অবিচলিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ মশায়, সম্প্রতি অবস্থা মন্দ হওয়াতে কিছু দেনা হইয়াছে, তাই বড়ো জড়াইয়া পড়িয়াছি।"
মহেন্দ্র কহিলেন, "তা, আপনার স্ত্রীর নিকট সাহায্য চাহিবার অর্থ কী। উপার্জনের ভার তো আপনার হাতে। আর, তিনি অর্থ পাইবেন কোথা।"
নির্লজ্জ নরেন্দ্র কহিল, "সেকি কথা! আমি সন্ধান লইয়াছি, আজকাল সে খুব উপার্জন করিতেছে। দিনকতক স্বরূপবাবু তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, শুনিলাম আজকাল আর কোনো বাবুর আশ্রয়ে আছে।"
মহেন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক কথাটার মন্দ অর্থ না লইয়া কিঞ্চিৎ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "আপনি জানেন তিনি আমার বাটীতেই আছেন।"
নরেন্দ্র কহিলেন, "আপনার বাটীতে ? সে তো ভালোই।"
মহেন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু তাঁহার কাছে অর্থ থাকিবার তো কোনো সম্ভাবনা নাই।"
নরেন্দ্র কহিলেন, "তা যদি হয়, তবে আমার চিঠির উত্তরে সে কথা লিখিয়া দিলেই হইত।"
মহেন্দ্র যেরূপ ভালো মানুষ, অধিক গোলযোগ করা তাঁহার কর্ব নয়। বকাবকি করিতে আরম্ভ করিলে তাহার আর অন্ত হইবে না জানিয়া মহেন্দ্র প্রস্তাব করিলেন--নরেন্দ্র যদি তাঁহার কু-অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করেন তবে তিনি তাঁহার সাহায্য করিবেন।
নরেন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল ; কহিল, "কু-অভ্যাস কী মশায়! নূতন কু-অভ্যাস তো আমার কিছুই হয় নাই, আমার যা অভ্যাস আছে সে তো আপনি সমস্ত জানেন।"
এই কথায় ভালোমানুষ মহেন্দ্র কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, সে তেমন ভালো উত্তর দিতে পারিল না। নরেন্দ্র পূর্বে এত কথা কহিতে জানিত না, বিশেষ মহেন্দ্রের কাছে কেমন একটু সংকোচ অনুভব করিত--সম্প্রতি দেখিতেছি সে ভারি কথা কাটাকাটি করিতে শিখিয়াছে। তাহার স্বভাব আশ্চর্য বদল হইয়া গিয়াছে।
মহেন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র তাহার সহিত মীমাংসা করিয়া লইয়া তাহাকে টাকা দিলেন ও কহিলেন, ভবিষ্যতে নরেন্দ্র যেন তাঁহার স্ত্রীকে অন্যায় ভয় দেখাইয়া চিঠি না লেখেন। মহেন্দ্র সেই আর্দ্র বাষ্পময় ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন ও পথের মধ্যে একটা ডাক্তারখানা হইতে একশিশি কুইনাইন কিনিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। দ্বারের নিকট দাসীটি বসিয়াছিল, সে মহেন্দ্রকে দেখিয়া অতি মধুর দুই-তিনটি হাস্য ও কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও মনে-মনে ঠিক দিয়া রাখিল--সেই কটাক্ষের প্রভাবে, মলয়-সমীরণে, চন্দ্রকিরণে মহেন্দ্র বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আজকাল রজনী ভারি গিন্নি হইয়াছে। এখন তাহার হাতে টাকাকড়ি আসে। পাড়ার অধিকাংশ বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া গৃহিণীরা রজনীর শাশুড়ির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শিঙ ভাঙিয়া রজনীর দলে মিশিয়াছেন। তাঁহারা ঘন্টাখানেক ধরিয়া রজনীর কাছে দেশের লোকের নিন্দা করিয়া, উঠিয়া যাইবার সময় হাই তুলিতে তুলিতে পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে আবশ্যকমত টাকাটা-শিকিটা ধার করিয়া লইতেন এবং রজনীর স্বামীর, রজনীর উচ্চবংশের ও চোখের জল মুছিতে মুছিতে রজনীর মৃত লক্ষ্মীস্বভাবা মাতার প্রশংসা করিয়া শীঘ্র সে ধারগুলি শুধিতে না হয় এমন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। কিন্তু এই পিসি-মাসি শ্রেণীর মধ্যে করুণার দুর্নাম আর ঘুচিল না। ঘুচিবে কিরূপে বলো। মাসি যখন সন্তোষজনকরূপে ভূমিকাটি শেষ করিয়া রজনীর কাছে কাজের কথা পাড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে হয়তো করুণা কোথা হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া রজনীকে টানিয়া লইয়া বাগানে চলিল। মাঝে মাঝে তাঁহারা করুণার ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি কেমন-ধারা গো ?' সে যে কেমন-ধারা করুণা তাহার কোনো হিসাব দিতে চেষ্টা করিত না। কোনো পিসির বিশেষ কথা, বিশেষ অঙ্গভঙ্গি বা বিশেষ মুখশ্রী

দেখিলে এক-এক সময় তাহার এমন হাসি পাইত যে, সে সামলাইয়া উঠা দায় হইত, সে রজনীর গলা ধরিয়া মহা হাসির কল্লোল তুলিত--রজনী-সুদ্ধ বিব্রত হইয়া উঠিত। তাহা ছাড়া রজনীর গিন্নিপনা দেখিয়া সে এক-এক সময়ে হাসিয়া আর বাঁচিত না।

কিছুদিন হইতে মহেন্দ্র দেখিতেছেন বাড়িটা যেন শান্ত হইয়াছে। করুণার আমোদ আহ্লাদ থামিয়াছে। কিন্তু সে শান্তি প্রার্থনীয় নহে--হাস্যময়ী বালিকা হাসিয়া খেলিয়া বাড়ির সর্বত্র যেন উৎসবময় করিয়া রাখিত--সে এক দিনের জন্য নীরব হইলে বাড়িটা যেন শূন্য-শূন্য ঠেকিত, কী যেন অভাব বোধ হইত। কয়দিন হইতে করুণা এমন বিষণ্ন হইয়া গিয়াছিল--সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কাঁদিত, কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। করুণা যখন এইরূপ বিষণ্ন হইয়া থাকে তখন রজনীর বড়ো কষ্ট হয়--সে বালিকার হাসি আহ্লাদ না দেখিতে পাইলে সমস্ত দিন তাহার কেমন কোনো কাজই হয় না। নরেন্দ্রের বাড়ি যাইবে বলিয়া করুণা মহেন্দ্রকে ভারি ধরিয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্র বলিল, সে বাড়ি অনেক দূরে। করুণা বলিল, তা হোক্। মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়ি বড়ো খারাপ। করুণা কহিল, তা হোক্। মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়িতে থাকিবার জায়গা নাই। করুণা উত্তর দিল, তা হোক্! সকল আপত্তির বিরুদ্ধে এই 'তা হোক' শুনিয়া মহেন্দ্র ভাবিলেন, নরেন্দ্রকে একটি ভালো বাড়িতে আনাইবেন ও সেইখানে করুণাকে লইয়া যাইবেন। নরেন্দ্রের সন্ধানে চলিলেন।

বাড়িভাড়া দিবার সময় হইয়াছে বলিয়াই হউক বা মহেন্দ্র তাঁহার বাড়ির ঠিকানা জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই হউক, নরেন্দ্র সে বাড়ি হইতে উঠিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্র তাঁহার বৃথা অন্বেষণ করিলেন, পাইলেন না।

এই বার্তা শুনিয়া অবধি করুণার আর হাসি নাই। বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ সময়ে, সহসা একএকটা কথা শুনিলে যেমন বুকে আঘাত লাগে, করুণার তেমনি আঘাত লাগিয়াছে। কেন, এত দিনেও

কি করুণার সহিয়া যায় নাই। নরেন্দ্র করুণার উপর কত শত দুর্ব্যবহার করিয়াছে, আর আজ তাহার এক স্থানান্তর সংবাদ পাইয়াই কি তাহার এত লাগিল। কে জানে, করুণার বড়ো লাগিয়াছে। বোধ হয় ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া হইয়া তাহার হৃদয় কেমন জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ এই একটি সামান্য আঘাতেই ভাঙিয়া পড়িল। বোধ হয় এবার বেচারি করুণা বড়োই আশা করিয়াছিল যে বুঝি নরেন্দ্রের সহিত আবার দেখা-সাক্ষাৎ হইবে। তাহাতে নিরাশ হইয়া সে পৃথিবীর সমুদয় বিষয়ে নিরাশ হইয়াছে, হয়তো এই এক নিরাশা হইতেই তাহার বিশ্বাস হইয়াছে তাহার আর কিছুতেই সুখ হইবে না। করুণার মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল--যে ভাবনা করুণার মতো বালিকার মনে আসা প্রায় অসম্ভব, সেই মরণের ভাবনা তাহার মনে হইল। তাহার মনে হইল, এ সংসারে সে কেমন শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে আর পারিয়া ওঠে না, এখন তাহার মরণ হইলে বাঁচে। এখন আর অধিক লোকজন তাহার কাছে আসিলে তাহার কেমন কষ্ট হয়। সে মনে করে, 'আমাকে এইখানে একলা রাখিয়া দিক, আপনার মনে একলা পড়িয়া থাকিয়া মরি।' সে সকল লোকের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া উঠিতে আর পারে না। সে সকল বিষয়েই কেমন বিরক্ত উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। রজনী বেচারি কত কাঁদিয়া তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিয়াছে, কিন্তু এই আহত লতাটি জন্মের মতো ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে--বর্ষার সলিলসেকে, বসন্তের বায়ুবীজনে, আর সে মাথা তুলিতে পারিবে না। কিন্তু একি সংবাদ! মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধান পাইয়াছে শুনিতেছি। মহেন্দ্র কারুণা ও নরেন্দ্রের জন্য একটি ভালো বাড়ি ভাড়া করিয়াছে। নরেন্দ্র মহেন্দ্রের ব্যয়ে সে বাড়িতে বাস করিতে সহজেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু একবার মন ভাঙিয়া গেলে তাহাতে আর স্ফূর্তি হওয়া সহজ নহে--করুণা এই সংবাদ শুনিল, কিন্তু তাহার অবসন্ন মন আর তেমন জাগিয়া উঠিল না। করুণা মহেন্দ্রদের বাড়ি হইতে বিদায় হইল--যাইবার দিন রজনী করুণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কতই কাঁদিতে লাগিল। করুণা চলিয়া গেলে সে বাড়ি যেন কেমন শূন্যশ ূন্য হইয়া গেল। সেই যে করুণা গেল, আর সে ফিরিল না। সে বাড়িতে সেই অবধি করুণার সেই সমধুর হাসির ধ্বনি এক দিনের জন্যও আর শুনা গেল না।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পীড়িত অবস্থায় করুণা নরেন্দ্রের নিকট আসিল। মহেন্দ্র প্রায় মাঝে মাঝে করুণাকে দেখিতে আসিতেন ; করুণা কখনো খারাপ থাকিত, কখনো ভালো থাকিত। এমনি করিয়া দিন চলিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র করুণাকে মনে মনে ঘৃণা করিত, কেবল মহেন্দ্রের ভয়ে এখনো তাহার উপর কোনো অসদ্‌ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু নরেন্দ্র প্রায় বাড়িতে থাকিত না--দুই-এক দিন বাদে যে অবস্থায় বাড়িতে আসিত, তখন করুণার কাছে না আসিলেই ভালো হইত। তাহার অবর্তমানে পীড়িতা করুণাকে দেখিবার কেহ লোক নাই। কেবল সেই দাসীটি মাঝে মাঝে আসিয়া বিরক্তির স্বরে কহিত, "তোমার কি ব্যামো কিছুতেই সারবে না গা। কী যন্ত্রণা !"

নরেন্দ্রের উপর এই দাসীটির মহা আধিপত্য ছিল। নরেন্দ্র যখন মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইত, তখন ইহার যত ঈর্ষা হইত, এত আর কাহারো নয়। এমন-কি নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিলে তাহাকে মাঝে মাঝে ঝাঁটাইতে ত্রুটি করিত না। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর ইহার অভিমানই বা দেখে কে। করুণার উপরেও ইহার ভারি আক্রোশ ছিল, করুণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জ্বালাতন করিয়া মারিত। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের সহিত ইহার মহা মারামারি বাধিয়া যাইত--দুজনই দুজনের উপর গালাগালি ও কিল চাপড় বর্ষণ করিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিত। কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতি আছে, নরেন্দ্র তাহার বিপদের দিনে ইহার সাহায্যে দিনযাপন করিতেন।

নরেন্দ্রের ব্যবহার ক্রমেই স্ফূর্তি পাইতে লাগিল। যখন তখন আসিয়া মাতলামি করিত, সেই দাসীটির সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়া দিত। করুণা এই-সমস্তই দেখিতে পাইত, কিন্তু তাহার কেমন এক প্রকারের ভাব হইয়াছে--সে মনে করে যাহা হইতেছে হউক, যাহা যাইতেছে চলিয়া যাক। দাসীটা মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর রাগিয়া করুণার নিকট গর্‌ গর্‌ করিয়া মুখ নাড়িয়া যাইত ; করুণা চুপ করিয়া থাকিত, কিছুই উত্তর দিত না। নরেন্দ্র আবশ্যকমত গৃহসজ্জা বিক্রয় করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাতেও কিছু হইল না--অর্থসাহায্য চাহিয়া মহেন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। করুণা বেচারি কোথায় একটু নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কোথায় সে মনে করিতেছে 'যে যাহা করে করুক--আমাকে একটু একেলা থাকিতে দিক', না, তাহাকে লইয়াই এইসমস্ত হাঙ্গাম ! সে কী করে, মাঝে মাঝে লিখিয়া দিত। কিন্তু বার বার এমন কী করিয়া লিখিবে। মহেন্দ্রের নিকট হইতে বার বার অর্থ চাহিতে তাহার কেমন কষ্ট হইত, তদ্ভিন্ন সে জানিত অর্থ পাইলেই নরেন্দ্র তাহা দুষ্কর্মে ব্যয় করিবে মাত্র।

একদিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র আসিয়া মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "পায়ে পড়ি, আমাকে আর চিঠি লিখিতে বলিয়ো না।" সেই সময় সেই দাসীটি আসিয়া পড়িল, সেও নরেন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিল--কহিল, "তুমি অমন একগুঁয়ে মেয়ে কেন গা ! টাকা না থাকলে গিলবে কী।"

নরেন্দ্র ক্রুদ্ধভাবে কহিল, "লিখিতেই হইবে।"

করুণা নরেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ক্ষমা করো, আমি লিখিতে পারিব না।"

"লিখিবি না ? হতভাগিনী, লিখিবি না ?"

ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া নরেন্দ্র করুণাকে প্রহার করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া পণ্ডিতমহাশয় প্রবেশ করিলেন ; তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া নরেন্দ্রকে ছাড়াইয়া দিলেন, দেখিলেন দুর্বল করুণা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিতমহাশয় নিধির টানাটানিতে গাড়িতে উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন কখনোই ভালো ছিল না। তিনি প্রায়ই মাঝে মাঝে মনে করিতেন, তাঁহার স্নেহভাগিনী করুণার দশা কী হইল ! এইরূপ অনুতাপে যখন কষ্ট পাইতেছিলেন এমন সময়ে দৈবক্রমে মোহিনীর সহিত সত্য-সত্যই

তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।
তাহার নিকট করুণার সমস্ত সংবাদ পাইয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিলেন। প্রথমে মহেন্দ্রের কাছে গেলেন, সেখানে নরেন্দ্রের বাড়ির সন্ধান লইলেন-- বাড়িতে আসিয়াই নরেন্দ্রের ঐ নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখিতে পাইলেন।
সেই মূর্ছার পর হইতে করুণার বার বার মুর্ছা হইতে লাগিল। মণ্ডিমহাশয় মহা অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি যে কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এই সময়ে তিনি নিধির অভাব অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মহেন্দ্রকে ডাকিতে গেলেন। মহেন্দ্র ও রজনী উভয়েই আসিল। মহেন্দ্র যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। করুণা মাঝে মাঝে রজনীর হাত ধরিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে কথা কহিত ; পণ্ডিতমহাশয় যখন অনুতপ্তহৃদয়ে করুণার নিকট আপনাকে ধিক্কার দিতেন, যখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, ‘মা, আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়াছি’, তখন করুণা অশ্রুপূর্ণনেত্রে অতি ধীরস্বরে তাঁহাকে বারণ করিত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত ‘নরেন্দ্রকে ডাকিয়া দিবে ?’ সে কহিত, “কাজ নাই।”
সে জানিত নরেন্দ্র কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র।
আজ রাত্রে করুণার পীড়া বড়ো বাড়িয়াছে। শিয়রে বসিয়া রজনী কাঁদিতেছে। আর পণ্ডিতমহাশয় কিছুতেই ঘরের মধ্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া বাহিরে গিয়া শিশুর ন্যায় অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতেছেন। নরেন্দ্র গৃহে নাই। আজ করুণা একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিল। নরেন্দ্র যখন গৃহে আসিলেন, তাঁহার চক্ষু লাল, মুখ ফুলিয়াছে, কেশ ও বস্ত্র বিশৃঙ্খল। হতবুদ্ধিপ্রায় নরেন্দ্রকে করুণার শয্যার পার্শ্বে সকলে বসাইয়া দিল। করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল, কিন্তু কিছু কহিল না।